সে এলো

বিমল মিত্র

অঙ্কুর
৫নং নরেন সেন স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ :
শ্রাবণ ১৩৭১

পরিবেশনায় : উজ্জ্বল বুক স্টোর
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

প্রকাশক : সুব্রত দাস ও
অশোক সাহা

প্রচ্ছদ : গৌতম কুণ্ডু

মুদ্রক : শ্রীভোলানাথ পাল
তনুশ্রী প্রিণ্টার্স
৪/১ই, বিডন রো
কলিকাতা-৭০০০০৬

অনুজ সাহিত্যিক

শ্রীতারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু

লেখকের অনবদ্য আরো কয়েকটি গ্রন্থ ঃ

নিবেদন ইতি

সাহেব বিবি গোলাম

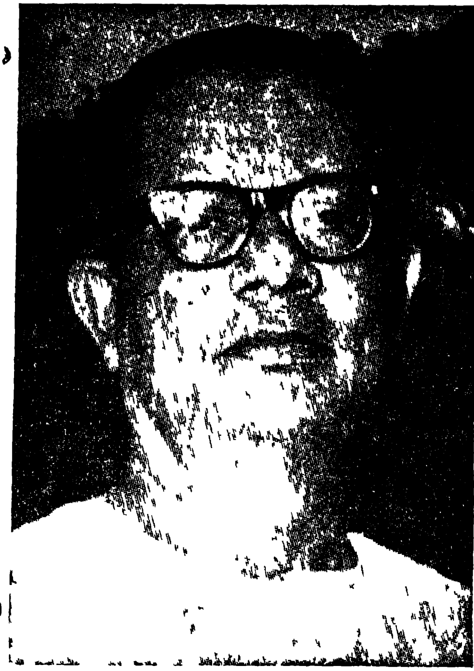
ভগবান কাঁদছে

গুল মোহর

রাণী সাহেবা

রাজ রাণী হও

কড়ি দিয়ে কিনলাম



বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার অসংখ্য অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমার নাম জাল করে প্রায় পাঁচ শতাধিক গল্প, উপন্যাস বাজারে চলছে। ঐ নামে অনেক ব্যক্তি থাকতে পারেন। দ্বিতীয় কোন লেখক নেই। আমার খ্যাতি প্রতিপত্তির সুযোগ নিয়ে বহু অসৎ প্রকাশক এই অসাধু উপায় অবলম্বন করেছেন, পাঠক-পাঠিকার কাছে তাই আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, আমার রচিত গ্রন্থ ক্রয় করবার আগে তারা যেন প্রথম পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর সহ ('বিশেষ বিজ্ঞপ্তি' দেখে তবে ক্রয় করেন)।

বিমল মিত্র

শেষ পর্যন্ত সে এলো।

অথচ কত বছর আগেই তো তার আসার কথা। আমার আত্মীয়-স্বজন সবাই-ই তো আশা করেছিল যে সে আসবে। আমাদের সংসার আলো করে দেবে সে এসে!

কিন্তু আমার মনে হলো সে না এসে যেন তখন ভালোই করেছিল। সেদিন সে এলে তো বুঝতেই পারতুম না যে আমাদের দেশে আমরা কত অন্যায়, কত অবিচার, কত অত্যাচারের মধ্যে বাস করছি। কত ঘুষ, কত কালো টাকা, কত হিংসে, আমাদের গ্রাস করে ফেলেছে।

অথচ আমি তো কত চেষ্টাই করেছি দেশ থেকে এই সব পাপ দূর করতে। দিনের পর দিন সারা দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছি সব রকমের পাপ দেশ থেকে উপড়ে ফেলতে, সব রকমের অনাচার দেশ থেকে মুছে ফেলতে।

কিন্তু কেন আমি তা পারলাম না?

কেন আমি এমন করে ব্যর্থ হলাম? কেন আমার সব প্রচেষ্টা এমন করে পণ্ড হলো? কেন মানুষ এমন করে সোনার হরিণের মতো টাকার পেছনে দৌড়তে শুরু করলো? কেন বাবা বাবার কর্তব্য পালন করতে ভুলে গেল? কেন ছেলে ছেলের কর্তব্য পালন করতে ভুলে গেল? কেন মা মায়ের কর্তব্য করতে ভুলে গেল? সকলের জীবনে কেন এমন করে পয়সাই পরমেশ্বর হয়ে উঠলো?

অথচ পঞ্চাশ বছর আগেও তো এমন ছিল না!

অথচ সে না এলে তো এ-সব কথা আমার মাথাতেই উদয় হতো না।

এ-সব কথা সুজয়ের। এতদিন পরে, এত বছর পরে সুজয়ের সঙ্গে যে ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে যাবে তা আমি ভাবিনি।

সুজয় আমার ছোট বেলাকার বন্ধু। ছোটবেলায় সুজয়কে আমার ঈর্ষা হতো। সুজয় গ্রাম থেকে পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছিল আমাদের বাড়িতে। আমি শুধু তার নামই শুনেছিলাম, কিন্তু চোখে তাকে তখনও দেখিনি।

দুপুরে টা-টা করছে রোদ। চারদিকে কাঠফাটা গরম। আমি খালি গায়ে ঘরের মধ্যে বসে ছিলাম। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে দরজা খুলে দিয়েছি। দরজা খুলে দিতেই দেখি আমার বয়েসী একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ সাজ-গোজ দুরস্ত। আমার দিকে কী রকম একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি দিয়ে একবার তাকিয়েই গট্-গট্ করে ভেতরে ঢুকে পড়লো। আমাকে যেন গ্রাহ্যই করলে না সে।

তারপরে ভেতরে গিয়ে ডাকতে লাগলো—মাসিমা, মাসিমা—

গলা শুনেই মা বোধহয় কিছু আন্দাজ করে বেরিয়ে এল। এসেই বললে—ওমা, সুজয়, তুই? কখন এলি?

সুজয় সে-কথার কোনও জবাব না দিয়ে বললে—তোমাদের চাকরটা তো বেশ পেয়েছ। কোথাকার লোক? বরিশালের? বিশ্বাসী তো? কত মাইনে নেয়?

মা ততক্ষণে বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটা। বললে-ওরে, কার কথা বলছিস রে?

সুজয় বললে—কেন, যে-ছেলেটা আমায় দরজা খুলে দিলে!

মা হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে—আরে ও যে আমার ছোট ছেলে—

—ওরই নাম বিমল? আরে, কী আশ্চর্য। অনেককাল আসিনি তো, তাই চিনতে পারিনি।

মা বললে—গরমকাল তো, তাই জামাটামা খুলে বসে আছে। তুই তো কতকাল আসিসনি কলকাতায়। তাই তোরই বা দোষ কী?

আসলে সুজয়ের কলকাতায় আসার কারণ তার নতুন একটা চাকরি পাওয়া। দেশ থেকে রেলের অফিসে একটা চাকরির দরখাস্ত

করেছিল। সে সূত্রেই সে আমাদের বাড়িতে এসেছিল।

ছোটবেলা থেকেই সুজয় ছিল আমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আদর্শ। আদর্শ কীসের দিক থেকে? লেখা-পড়া নয়, মিষ্টি কথা-বার্তায় নয়, এমন কি তার চেহারার জন্যেও নয়। আদর্শ ছিল অন্য কারণে। সে কারণটা হলো তার পোশাক-পরিচ্ছদের বাহারে।

সুজয় আমাদেরই মত সাধারণ প্যান্ট-শার্ট পরতো কিন্তু কেন জানি না সেই সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদেও তাকে দেখে মনে হতো সে যেন খুব সাজগোজ করেছে। মাথার চুল থেকে আরম্ভ করে পায়ের জুতো পর্যন্ত সমস্ত কিছুর মধ্যেই তাকে দেখে মনে হতো সে যেন অসাধারণ!

সংসারে কে না চায় অসাধারণ হতে? আর অসাধারণ হবো বললেই তো আর অসাধারণ হওয়া যায় না। তার জন্যে বোধহয় ঈশ্বরের আশীর্বাদ থাকা অনিবার্য হয়।

সুজয়ের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়াও ছিল এক মহাবিড়ম্বনার ব্যাপার। তখন মেয়েরা রাস্তায় বেরোত না। সে রেওয়াজ তখনও চল হয়নি কলকাতা শহরে। আর গ্রামে তো নয়ই।

রাস্তায় চলতে চলতে সে হঠাৎ বলতো—দেখেছিস ওরা কেমন আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে?

আমি আশে পাশে কোনও দিকে চেয়ে এমন কাউকেই দেখতে পেতাম না যাতে মনে হয় কেউ ওকে দেখছে।

আমি জিজ্ঞেস করতাম—কই, কে তোকে দেখছে?

সুজয় বলতো—ওই তো, বাঁ পাশের বাড়িটার তেতলার জানলার দিকে চেয়ে দেখ, দুটো মেয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে—

সত্যিই দেখতাম সুজয়ের তির্যক নজর আছে সব দিকে। বিশেষ করে মেয়েদের ব্যাপারে। তার ধারণা ছিল কলকাতা শহরে মেয়েরা খুব সুলভ আর আরো তার একটা ধারণা ছিল এই যে সে সুপুরুষ। তার মত সুপুরুষকে পেলে যে-কোনও মেয়ে বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়ে যাবেই।

এ-রকম পাগল সংসারে অনেক আছে, এ আমার জানা ছিল। কিন্তু সুজয়ও যে সেই রকম হবে তা আমার জানা ছিল না।

এও হতে পারে যে হয়তো গ্রামের ছেলে বলেই সুজয় এমন হয়েছিল। সে ভাবতো যে তার মতন সুপুরুষ বোধহয় ভূভারতে নেই। সেই সুপুরুষ চেহারাটাকে আরো সুদৃশ্য করতে বাজারে যতো রকমের কস্‌মেটিকস্‌ পাওয়া যেত তা সবই সে কিনে ব্যবহার করতো। তার গায়ে মাথার সাবান ছিল সব চেয়ে দামী। তখনকার দিনে সাধারণ গায়ে মাথার সাবানের দাম ছিল চার আনা থেকে আট আনা। কিন্তু সে যে সাবান ব্যবহার করতো তার দাম পাঁচ সিকের কম নয়।

খবরের কাগজ খুলেই সে প্রথমে দেখতো বিজ্ঞাপনগুলোর দিকে। সেইগুলোই সে প্রথমে পড়তো। তারপরে খবর।

তখন 'হিমানী', 'মীরা', 'লাক্স', সাবানগুলোর বিজ্ঞাপন খুব জাঁকজমক করে ছাপা হতো খবরের কাগজে। অনেক সময় সঙ্গে থাকতো সিনেমা অভিনেত্রীদের বিরাট বিরাট সুন্দর মুখের ছবি।

তাতে অনেক সময়ে সে যুগের বিখ্যাত অভিনেত্রী সাধনা বসুর ছবিও থাকতো। সেই ছবির নিচে লেখা থাকতো ঃ

"আমি নিয়মিতভাবে 'মীরা' সাবান দিয়ে স্নান করি, তাতে আমার ত্বক খুব সুন্দর ও মসৃণ থাকে।"

ইতি—সাধনা বসু

বিজ্ঞাপনের নিচে নামের জায়গায় সাধনা বসুর সই থাকতো।

সুজয় বিজ্ঞাপনটা দেখেই একদিন 'মীরা' সাবান কিনে আনলে। বললে—এই ছাখ, এবার থেকে আমি এই সাবানটাই মাখবো। সাধনা বোস রোজ এই সাবান দিয়ে চান করে বলেই ওকে দেখতে অত সুন্দর—

দু'দিন ওই সাবানটা মেখেই সুজয় বললে—আমাকে আগের চেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে, না রে ?

আমি বলতাম—হ্যাঁ, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে—

কত মানুষের কত রকমের পাগলামি থাকে তা বোধহয় গুণে শেষ করা যায় না।

আর শুধু কি সাবান! প্রমথেশ বড়ুয়ার সেযুগে খুব নাম। তাঁর মতো শার্ট তৈরি করিয়ে নিলে সুজয়। মাথার চুলের স্টাইলও প্রমথেশ বড়ুয়ার মতো করলে। একেবারে হুবহু প্রমথেশ বড়ুয়ার মতো। হেয়ার কাটিং সেলুনে গিয়ে ঠিক সেই রকম মাথার চুল তৈরি করার পর আমাকে জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কীরকম দেখাচ্ছে বল তো?

আর শুধু কি তাই? ঘরের দেওয়ালে কোথা থেকে একটা প্রমথেশ বড়ুয়ার ছবি জোগাড় করে ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখলে।

আর শুধু যে প্রমথেশ বড়ুয়া, তাই নয়। আরো যে কত সিনেমা অভিনেতা-অভিনেত্রীর ছবি দেওয়ালে টাঙানো তার ঠিক নেই। সে-সব নামও এখন মনে নেই। মেরী পিকফোর্ড, মার্লেন ডিয়াট্রিচ্, মেরিলীন মানরো, লিলিয়ান গিশ।

সুজয়ের বাবার টাকা ছিল অনেক। সেই টাকায় সে ভালো ভালো জামা-প্যান্ট কিনতো আর তখনকার দিনে বাজারে যত সিনেমা আসতো সবগুলো দেখতো, দেখা চাই-ই তার। বেশি দেরি করে দেখলে চলবে না। প্রথম 'শো'তেই দেখা চাই। তা না হলে সুজয় হেরে যাবে। সুজয়ের প্রেসটিজ পাংচার হয়ে যাবে।

মা জিজ্ঞেস করতো—অত সিনেমা দেখিস কেন রে তুই? ওতে যে চোখ খারাপ হয়ে যাবে রে তোর? অত সিনেমা দেখা কি ভালো?

কিন্তু কে কার কথা শোনে? ছোটবেলায় বড়দের উপদেশ শুনতে সকলেরই খারাপ লাগে। বিশেষ করে ওই বয়েসে। বাড়ির বাইরে ছেলেরা কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে মিশছে, কী খাচ্ছে, তা বাড়ির লোকেরা কী করে জানবে।

আমি না বললে মা জানতেও পারতো না।

সুজয় আমার ওপরেই রেগে যেত। বলতো—তুই কেন, মাসিমাকে বলে দিলি?

তারপর রেগে গিয়ে বলতো—যা, তোকে আর কখনও সিনেমায় নিয়ে যাবো না—

আসলে তার সিনেমা দেখবার আসল কারণ ছিল মেয়েদের দেখা। সেযুগ ছিল ইংরেজি হলিউডের সিনেমার যুগ। তখন ইংরেজ রাজত্বের রমরমার আমল। বাঙালী মেয়েদের রাস্তায় বেরোতে দেখা যেত না। সেই অভাবটা মেটাতো হলিউডের ইংরেজি সিনেমা। সেখানে নারী-পুরুষের অবাধ অন্তরঙ্গতা, অবাধ সাহচর্য। যা দেশী চেহারায় দেখা যায় না, তা বিলিতি ছবি হয়ে চোখের ক্ষিধে মনের ক্ষিধে সব কিছু মিটিয়ে দেয়। যা সশরীরে আসে না তা অশরীরী হয়ে মনে রং ধরায়। মেরী পিকফোর্ড, মার্লিন ডিয়াট্রিচ, মেরিলীন মনরোরা সিনেমায় অশরীরী বটে, কিন্তু মনের জগতে তারা সশরীরী হয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো।

তাই বলছিলাম—শেষ পর্যন্ত সে এলো।

অথচ কত বছর আগেই তো তার আসার কথা। আমার আত্মীয়-স্বজন সবাই-ই তো তাই আশা করেছিল একদিন সে আসবে। আমাদের সংসার আলো করে দেবে এসে।

কিন্তু আমার মনে হলো সে না এসে যেন তখন ভালোই করেছিল। সেদিন সে এলে তো বুঝতেই পারতুম না যে আমাদের দেশে আমরা কত অন্যায়, কত অবিচার, কত অত্যাচারের মধ্যে বাস করছি। কত ঘুষ, কত কালো টাকা, কত হিংসে আমাদের গ্রাস করে চলেছে।

অথচ আমি তো কত চেষ্টাই করেছি দেশ থেকে এই সব পাপ দূর করতে। দিনের পর দিন সারা দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছি সব রকমের পাপ দেশ থেকে উপড়ে ফেলতে, সব রকমের অনাচার দেশ থেকে মুছে ফেলতে।

কিন্তু কেন আমি তা পারলাম না?

কেন আমি এমন করে ব্যর্থ হলাম? কেন আমার সব প্রচেষ্টা এমন করে পণ্ড হলো? কেন মানুষ এমন করে সোনার হরিণের মত টাকার পেছনে দৌড়তে শুরু করলো? কেন বাবা বাবার কর্তব্য

করতে ভুলে গেল। কেন ছেলে ছেলের কর্তব্য পালন করতে ভুলে গেল? কেন মা মায়ের কর্তব্য করতে ভুলে গেল? সকলের জীবনে কেন পয়সাই পরমেশ্বর হয়ে উঠলো?

অথচ পঞ্চাশ বছর আগেও তো এমন ছিল না।

অথচ সে না এলে তো এ-সব কথা আমার মাথাতেই উদয় হতো না।

সেই আগেকার সুজয় আর আজকের এই সুজয়ের কথায় কত তফাৎ! যে-সুজয় একদিন নিজের রূপ আর সিনেমার অভিনেত্রী নিয়ে মাথা ঘামাতো, যে সুজয় প্রমথেশ বড়ুয়ার মতো শার্ট পরতো আর সাধনা বোস যে-সাবান মাখতো সেই সাবান মেখে মেয়েদের চোখে আকর্ষণীয় হওয়ার চেষ্টা করতো, সেই সুজয়ই আবার এত বদলে গেল যে বিশ্বাসই করা যায় না।

এমনও হয়?

বহু বছর পরে সুজয়ের সঙ্গে দেখা হতেই সুজয়ের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—সেই সব দিনের কথা মনে আছে তোর? সেই যে সাধনা বোসের সার্টিফিকেট দেওয়া সাবান তুই কিনতিস?

সুজয় হাসতে লাগলো। বললে—হ্যাঁ, খুব মনে আছে—

—আর সেই প্রমথেশ বড়ুয়ার মতো শার্ট তৈরী করতিস দর্জিকে দিয়ে?

সুজয়ের সব মনে আছে। বললে—হ্যাঁ, খুব মনে আছে। তখন কত ছেলেমানুষ ছিলুম তাই ভাবি—

আবার জিজ্ঞেস করলাম—তোর মনে আছে সেই কত সব সিনেমা-স্টারদের ছবি ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতিস?

সুজয় আরো হাসতে লাগলো। বললে—তোর সব মনে আছে দেখছি—

বললাম—মনে থাকবে না? মানুষের জীবনের এই বিচিত্র দিকগুলো মনে থাকে বলেই তো লেখক হয়েছি। এই সব নিয়েই তো আমার কারবার রে—

সুজয় বলতে লাগলো—সত্যিই তোর এত সব মনে থাকে কী করে?

বললাম—মন নিয়েই তো আমার কারবার। মনে থাকে বলেই তো হাজার-হাজার পাতার মোটা মোটা বই সকলকে নাকে দড়ি দিয়ে টানতে টানতে শেষ লাইন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পেরেছি। একবার যে পড়তে আরম্ভ করে সে বই শেষ না-করা পর্যন্ত আর উঠতে পারে না—

সুজয় বললে—মধ্যপ্রদেশের লোকরাও তাই বলে—

বললাম—আমার কথা থাক। তোর কথা বল তুই। শেষ পর্যন্ত কে এলো সেইটেই বল তুই।

সুজয় বললে—সে। সে এলো।

কে? কে এলো? কার কথা বলছিস? বন্দিতা?

সুজয় বললে—দূর, বন্দিতা হবে কেন?

- তবে কি কণিকা?

সুজয় আবার বললে—দূর, কণিকা হতে যাবে কেন?

—তবে কি অলকা?

বন্দিতা, কণিকা, অলকা সবাই সুজয়ের ছাত্রী। সুজয় সেই বয়েসে একটা চাকরিতেও ঢুকেছিল আবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের টিউশনিও করতো। আর ছাত্র-ছাত্রী পড়ানোর ব্যাপারে যদি একবার কোনও রকমে খ্যাতি হয়ে যায় তো তখন অন্য সব ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা এসে পীড়াপীড়ি করে তাদের ছেলে-মেয়েদেরও পড়াতে।

তা সুজয়েরও হয়েছিল তাই।

শিক্ষক হিসেবে যেই সুজয়ের নাম হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে তার ছাত্র-ছাত্রীদের মহলে আরো সুনাম ছড়িয়ে পড়লো। সুজয় যে-ছাত্র বা যে-ছাত্রীকে পড়াবে সে ভালো করে পাশ করে যাবেই—এ ধারণাটা

বদ্ধমূল হয়ে গেল অভিভাবক মহলে। তাতে তার দিন-দিন আয় বাড়তে লাগলো। আর টিউশানির পুরো টাকাটাই তো ব্ল্যাক টাকা। সেটার হিসেব ইনকাম-ট্যাক্স অফিসে দিতে হয় না।

ইতিমধ্যে সুজয়ের বাবা-মা আত্মীয়দের অনেকেই গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে পড়েছে। একটা বাড়ি ভাড়াও করে নিয়ে সুজয় আমাদের বাড়ি ছেড়ে তাদের বাসা-বাড়িতে উঠে গেছে।

আর চাকরি ?

চাকরিটাও সে তখন পেয়ে গেছে রেলের অফিসে। তখনকার দিনে রেলের অফিসে চাকবি হওয়া মানে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া। সে চাকরি জীবনে কখনও যাবে না। চুরি-চামারি না করলে সে-চাকরি খাবাব সাধ্য নেই কারো। তার সঙ্গে আছে ট্রেনের প্রথম শ্রেণীতে সারা ইণ্ডিয়া ভ্রমণেব সুযোগ। তার ওপর আছে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বা পেনশনের সুবিধে।

তখনকার দিনে এ-সুবিধে আর কোনও চাকরিতে পাওয়া যেত না। সুতরাং বিয়ের বাজাবে বিয়ের-যোগ্য মেয়েদের গুরুজনদের কাছে রেলের চাকরি করা পাত্রদেব চাহিদা ছিল বড্ড বেশি।

পরে অবশ্য এল আই. সি বা ব্যাঙ্কের চাকরি করা পাত্রদের চাহিদা বেড়েছে। কিন্তু তার আগে বেলেব চাকরি করা পাত্রদেরই ছিল বেশি প্রাধান্য। তাদের সঙ্গেই সবাই নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে চাইতো।

তা সেই জন্যেই তখন আমার আর রোজ-রোজ দেখা হতো না সুজয়েব সঙ্গে। দিনের বেলা সে চাকরি করতো আর সকালে সন্ধ্যেয় মেয়েদের পড়াতো।

যদিই বা কখনও কখনও দেখা হতো তো ছুটির দিন বা রবিবার। কিন্তু তাও খুব কম। কারণ সে-সব দিনগুলো সে সিনেমা দেখে কাটাতো। সিনেমা দেখা তার সপ্তাহে একদিন কি দু'দিন চাই-ই চাই। সিনেমা না দেখলে তার পেটের ভাতই হজম হতো না।

আমি জিজ্ঞেস করতাম—এত সিনেমা দেখিস কেন তুই ?

সুজয় বলতো—ইংরেজি শেখবার জন্যে।

শয়তানেরও একটা না একটা যুক্তি থাকেই। তখন ইংরিজি সিনেমার যুগ। আসলে যে সে বিলিতি মেয়েদের দেখতে যেতো সেটা সে মুখে প্রকাশ করতো না। ইংরিজি সিনেমাতে চুমু খাওয়ার দৃশ্য থাকতো, বিকিনি পরে স্নান করার দৃশ্য থাকতো। সেই সবই ছিল বিলিতি সিনেমার প্রধান আকর্ষণ। দিশী সিনেমাতে তো ও-সব কড়া হাতে সেনসর করা হতো।

তখন সুজয়ের পুরো পরিবারটাই কলকাতায় এসে গেছে। আর তারও নিজের আয় বেড়েছে। সেই আয়ের টাকায় তখন সে-ই বা কে আর জগদীশ্বরই বা কে ?

আমার সঙ্গে তখন আর আগেকার মতো সুজয়ের দেখা হতো না। যখন দেখা হতো তখন কেবল একটা কথাই হতো– সেটা হচ্ছে তার নিজের প্রশংসা। মানে নিজের চেহারার প্রশংসা।

বলতো—আমাকে কেমন দেখাচ্ছে রে আজ ?

আমি বলতাম—কেন, ভালোই তো দেখাচ্ছে—

সুজয় তবু খুশি হতো না আমার ওই মামুলি জবাব শুনে—

বলতো—স্পেশ্যাল কিছু দেখছিস না ?

আমি আরো মনোযোগ দিয়ে তাকে দেখতাম। কিন্তু 'স্পেশ্যাল' কিছুই দেখতে পেতাম না।

সুজয় বলতো—কিছুই স্পেশ্যাল দেখতে পাচ্ছিস না ?

বলতাম - কই, না তো—

সুজয় বলতো—দূর, তোর চোখটা খারাপ হয়ে গেছে, তুই চশমা নে। এই শার্টটা নতুন করিয়েছি। আড়াই টাকা করে কাপড়ের গজ, তা জানিস ?

তখনকার দিনে শার্টের কাপড়ের গজ আড়াই টাকা করে—সেটা বড় মামুলি কথা নয়। তখন টাকার দাম ছিল খুব। আমরা সাধারণত বাজার থেকে রেডিমেড শার্টই কিনতাম। কিন্তু সুজয় তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নয়। সে ছোটবেলা থেকেই অসাধারণ। অসাধারণ হওয়ার জন্যে সে ছোটবেলা থেকেই চেষ্টা করে আসছে।

সাধারণ হয়ে বেঁচে থাকবার জন্যে সে পৃথিবীতে জন্মায়নি। সুতরাং সে তো আড়াই টাকা গজের কাপড় দিয়ে শার্ট করাবেই।

সে জন্যে আমার কিন্তু কোনও দুঃখও ছিল না। সেজন্য আমি কখনও তাকে হিংসেও করতাম না যে-যার নিজের নিজের মানসিকতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। সুতরাং তাকে কখনও আমি দোষ দিতাম না। সে যদি নিজের শার্ট, নিজের মাথার চুল, নিজের সাবান নিয়ে সুখী হয় তো হোক।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে এইটেই ছিল আমাদের দু'জনের সম্পর্ক। তা সেই সুজয় এত বছর পরে চাকরি থেকে রিটায়ার করে আবার কলকাতায় ফিরে এসেছে। এই ক'বছরে পৃথিবীর মানচিত্রে কতবার রং বদলেছে, কতবার ইতিহাস কত ওলোট পালোট ঘটিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সব চেয়ে বেশি পরিবর্তন হয়েছে বুঝি সুজয়ের। কোনও মানুষ যে এমনভাবে বদলাতে পারে তা আমার আগে জানা ছিল না।

তাই সে-যখন বললে যে—'সে এলো' তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম—কে এলো ?

সুজয় বললে—সেই জয়ন্তী।

—জয়ন্তী মানে ?

সত্যিই আমি বুঝতে পারিনি জয়ন্তী কে ? কোন্ জয়ন্তী !

অত বছর আগেকার কথা তো আমার পক্ষে মনে করে রাখা সম্ভব নয়।

আর সেকি আজকের কথা ? তখন তো পৃথিবীময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব চলছে! সেই যুদ্ধের সময়েই সুজয় চাকরি পেয়ে গেল রেল দপ্তরে। বেশ ভালো চাকরি। আর তখন সুজয় বিয়েও করেনি। সস্তা গণ্ডার যুগ। তখনও জিনিসপত্রের দাম এমন আগুন হয়ে ওঠেনি। বাসা-বাড়িরও ততো আকাল পড়েনি। অনেক বাড়ির বাইরে দেওয়ালের গায়ে লেখা থাকতো—'টু-লেট'।

অর্থাৎ 'এই বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে।' এ-রকম ঘটনার কথা

আজকালকার লোক বিশ্বাস করতে চাইবে না। বিশ্বাস না করতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই যুগে এমন ঘটনাও সাধারণ বা স্বাভাবিক বলে ধরা হতো।

ওই 'টু-লেট' লেখাটা দেখেই অনেক লোক বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করতো।

সুজয় এমনিই একটা 'সাইন-বোর্ড' দেখে সদর-দরজার কড়া নাড়তে লাগলো, বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক বেরিয়ে আসতেই সুজয় জিজ্ঞেস করলে আপনার বাড়ি কি ভাড়া দেওয়া হবে?

বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ—

সুজয় বললে—আমরা আপনার বাড়ি ভাড়া নিতে চাই। একবার দেখতে চাই ঘরগুলো—

ভদ্রলোক তো মহা খুশী। ভাড়াটে পাওয়া সে-যুগে সৌভাগ্যের কথা বলে বিবেচিত হতো। এখনকার মানসিকতার ঠিক উল্টো। এখন সেলামীর প্রসঙ্গ ওঠে, আগাম-শোধের কথা ওঠে, আরো কত কী বখেড়ার প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু তখন বাড়ি আর ভাড়ার অঙ্কটাই প্রধান ছিল। বাড়ি যদি ভালো হতো আর ভাড়া যদি অপেক্ষাকৃত কম হতো, আর হাট-বাজার, বাস-ট্রাম যদি কাছে হতো তাহলে বাড়ি পছন্দ হওয়ার পক্ষে আর কোনও বাধা থাকতো না।

শেষ পর্যন্ত সেই বাড়িতেই উঠে গেল সুজয়রা। সুজয়ের বাবা মা আর সে।

আশুতোষ চক্রবর্তী বাড়ি পেয়ে খুব খুশী। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোকও খুব খুশী। আমরাও খুশী যে সুজয়দের কাছাকাছি থাকতে পারবো আমরা। বাস বা ট্রামের তোয়াক্কা করতে হবে না।

কিন্তু কাছাকাছি থাকলে কী হবে, সুজয়ের সঙ্গে বেশি দেখা হওয়ার সুযোগ কিন্তু আরো কমে গেল। যখনই যেতাম মেসোমশাই বলতেন—সুজয় তো বাড়িতে নেই বাবা—

জিজ্ঞেস করতাম—কোথায় গেছে সে?

মেসোমশাই বলতেন—তার কি কোনও ঠিক-ঠিকানা আছে? সে

তো বলে যায় না কোথায় যাচ্ছে—

যতদিন যেতে লাগলো ততোই সে আরো টিউশানি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আর মজা এই যে সবই কেবল ছাত্রী। ছাত্রী মহলেই তার খ্যাতি ছড়াতে লাগলো বেশি করে। দিনের বেলা চাকরি আর সকালে সন্ধ্যেয় ছাত্রী পড়ানো। ছাত্রীদের পড়িয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে দশটা এগারোটা বেজে যেত।

আর রবিবার?

রবিবার দুপুর থেকে আরম্ভ করে দু'তিনবার সিনেমা দেখা। শুধু রবিবার সকাল বেলাটাই যা তার সঙ্গে আমার একটু দেখা হতো!

আর আমি মাঝে মাঝে সেই সময়টাতেই তার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম তার বাড়িতে।

আর দেখা হলেই সে কী কী সিনেমা দেখেছে তারই তালিকা দিত। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের রূপ-গুণ, অভিনয়ের কৃতিত্ব, আর সিনেমাগুলোর গল্পগুলোই সংক্ষেপে জানাতো।

বলতো—তুই যদি পারিস তো অন্ততঃ ওই সিনেমাটা দেখিস। দেখবি অনেক কিছু শিখতে পারবি। এই যে আমি এত টাকা উপায় করছি টিউশানি করে, এর কারণ আর কিছু না, ওই সিনেমা। সিনেমা না দেখলে আমি এত ভালো ইংরিজী শিখতে পারতুম না—

ওর ঘরের দেওয়ালে টাঙানো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবিগুলো দেখে আমার মনে কিন্তু ঈর্ষা হতো না ওর ওপর, উল্টে দুঃখ হতো। তাহলে কি ওরাই ওর আদর্শ? ওই ছবিগুলো ছাড়া ওর কি আর কোনও আদর্শ নেই?

আসলে মুখ ফুটে আমি কিছুই বলতাম না। বললে হয়তো ও আমাকে ভুল বুঝতো। মনে করতো আমি ওকে হিংসে করি। ও যে আমার চেয়ে বড়ো সেই রকম মুখের ভাব রেখেই আমি ওর সঙ্গে মিশতাম, কথা বলতাম, বন্ধুত্ব বজায় রাখতাম। ও মনে করতো আমি ওর কথাগুলো আদ্যোপান্ত বিশ্বাস করছি।

আর মেসোমশাই মাসিমা?

তাঁদেরও অনেক গর্ব ছিল সুজয়ের জন্যে। যে-ছেলে বেশি টাকা উপায় করে তার জন্যে তো বাবা-মা'র গর্ব থাকবেই। তা সে টাকা সে কেমন করে কীভাবে উপায় করে তা দেখবার দায় তাঁদের নেই।

কিন্তু ধরা পড়লো সুজয়ের বিয়ের সময়ে।

রোজগেরে ছেলের বিয়ে নিয়ে কোনও সমস্যা কোনও কালেই হয় না, এইটেই সাধারণ নিয়ম। সে-যুগে ছেলে-মেয়েদের এই অবাধ মেলামেশার সুযোগ ছিল না। কারণ তখন সে-রকম সমস্যাও ছিল না। তা ছাড়া সুজয় ছিল সুদর্শন স্বাস্থ্যবান ছেলে। তার সঙ্গে পাকা চাকরির এবং মোটা মাসিক অর্থ উপার্জন করার কৌলিন্য।

মেসোমশাই মাসিমা দু'জনেই সুজয়ের বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁদের অনেক নিকট আত্মীয়-স্বজন কলকাতায় রয়েছে। তাদের কাছেও খবর গেল যে সুজয়ের বিয়ের জন্যে পাত্রী দরকার। যদি তেমন কোনও পাত্রীর সন্ধান তোমাদের জানা থাকে তো অবিলম্বে জানাও।

এই বিয়ের ব্যাপারে সুজয়ের বন্ধু বসন্তর আগ্রহই বেশি। বসন্তর বিয়ে অনেক আগেই হয়ে গিয়েছে। সে সুজয়ের সঙ্গে এক অফিসেই পাশাপাশি বসে চাকরি করে। থাকেও সুজয়ের বাসা-বাড়ির কাছাকাছি।

মাসিমা তাকেও কথাটা একদিন বললেন।

সে তো এ-ব্যাপারে এক পায়ে খাড়া। বললে—ক'টা পাত্রী চাই বলুন না। সুজয়ের মতো ছেলের জন্যে পাত্রীর কি অভাব? খবর পেলেই এখুনি আপনাদের বাড়ির সামনে মেয়ের বাপেদের লাইন লেগে যাবে।

মেসোমশাই বললেন—তাই দেখ বাবা, তোমার ওপরেই সুজয়ের বিয়ের ভারটা ছেড়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে রইলাম।

তখনও ইংরেজদের আমল চলছে। কিন্তু এ-দেশের মানুষরা দুশো বছর ধরে ইংরেজদের অধীনে থেকেও কখনও ইংরেজ হয়ে উঠতে পারেনি বা ইংরেজ হতে চায়নি। যে-সব লোক পুরোপুরি ইংরেজী-

ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। আসলে ইংরেজরা বিয়ে করে আর ভারতীয়দের বিয়ে হয়।

এ-ক্ষেত্রে সুজয়ের যাতে বিয়ে হয় সেই চেষ্টাই তখন থেকে শুরু হলো।

সুজয় নিশ্চিন্ত ছিল যে, তার মতো পাত্রের বিয়ে হওয়াটা একটা সহজ ব্যাপার। শুধু কলকাতা কেন পুরো বাঙলাদেশের সমস্ত ব্রাহ্মণ বংশের বাঙালী বিবাহযোগ্যা কন্যার অভিভাবকরা তার মতো পাত্রের সন্ধান পেয়ে তাদের বাড়ি চড়াও হবে।

বসন্তও সেই একই কথা বললে। সে বললে—এখন বেশি হই-চই না-করাই ভালো। নইলে বাড়িতে এত ভিড় হয়ে যাবে যে, সামলে উঠতে পারবো না। মেয়ে-সিলেকশন্ অত সোজা জিনিস নয়—

এ-ব্যাপারে সুজয়ও তার সঙ্গে একমত। সে বললে—ফার্স্ট কাজ হলো মেয়ের কপালটা দেখা। যে-মেয়ের যত ভালো কপাল সে-ই ততো সুলক্ষণা, জানিস?

বসন্ত বললে—কপাল তো আছেই, তার চেয়ে আরো ইম্‌পর্ট্যান্ট হলো মেয়েদের ভুরু—যদি জোড়া ভুরু হয় তো সে মেয়ে বেস্ট। আমার বউকে দেখিসনি? আমার বউ-এর ভুরুটা জোড়া। ওটা লক্ষ্মীর চিহ্ন। ওই চিহ্নটা দেখেই আমার বাবা ওই মেয়েকে সিলেক্ট করেছিল—

সুজয় বললে—শুধু কপাল আর ভুরু কেন? চোখ? চোখটা কি ফ্যালনা?

বসন্ত বললে—ওই একই কথা। কপাল, ভুরু, চোখ তিনটেই ভালো হওয়া চাই, তিনটে জিনিস ভালো হলেই তবে বিয়ের পাকা কথা দেব।

—আর গায়ের রং?

বসন্ত বললে—রং-এর কথাটা আর বলছিস কেন? সকলের আগে দুধে-আলতা গায়ের রং তো হওয়া চাই-ই। ওটা না-বললেও চলবে।

সুজয় বললে—আজকাল বাজারে অনেক রকম কস্‌মেটিকস্

বেরিয়েছে যা মাখলে কালো মেয়েদেরও লাল-টক্‌টকে ফরসা দেখায়—

বসন্ত বললে—সে আমাকে বলতে হবে না, কোন্‌টা আসল চামড়ার রং আর কোনটা পেন্টিং করা গায়ের রং তা আমি এক নজরে বুঝে ফেলবো। আমি কেমিষ্ট্রির বি,এস,সি, আমাকে ঠকানো অত সহজ নয়।

এসব নিয়ে সুজয় আর বসন্ত দু-জনের তুমুল আলোচনা হতো।

ঘটক আগে থেকেই লাগানো হয়েছিল। বহু ঘটকালি করে সে হাত পাকিয়ে ফেলেছে। তাকে আগামও কিছু টাকা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে এসে এক একটা পাত্রীর খবর দিয়ে পাঁচ টাকা বা সাত টাকা নিয়ে যায়।

মেসোমশাই ঘটককে জিজ্ঞেস করেন—পাত্রীর বাপ কী করেন?

ঘটক পাকা। তখন তিন পুরুষ ধরে তাদের ঘটকের কারবার। সারা দেশ তাকে চরে বেড়াতে হয়। নামেও বরদা ঘটক, কাজেও বরদা ঘটক। মেয়েদের বর জুটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আদর্শ।

বললে—বাপের গুণের শেষ নেই। তাঁর এইটেই প্রথম সন্তান। আর কোনও সন্তানই হয়নি। উত্তর-পাড়ায় এক বিঘে জমির ওপর পাকা দোতলা বাড়ি। জমি-বাড়ি নিয়ে প্রায় এক লাখ টাকা দাম হয়। বাপ মারা গেলে সমস্ত সম্পত্তি আপনার ছেলেই পাবে, তা তো বুঝতে পারছেন—

মেসোমশাই বলতেন—তুমি বাপের সম্পত্তির কথা এত বার করে বলছো কেন? আমি কি ছেলে বিক্রী করবো বলতে চাও? তুমি মেয়ে কেমন তাই আমাকে বলো—

বরদা ঘটক বলতো—মেয়ে যদি দেখতে খারাপ হতো, কি মেয়ের গায়ের রং খারাপ হতো তো আমি কি এ-সম্বন্ধ আনতুম?

মেসোমশাই বলতেন—মেয়ে কেমন দেখতে তাই আগে বলো। মেয়ের কপাল কেমন দেখতে?

—কপাল কপাল মানে?

বরদা ঘটক প্রথমে অবাক হয়ে যেতো কপালের কথা শুনে।

কপাল মানে? ভাগ্য? তা, সেটা কি কেউ দেখতে পায়? সে তো কুষ্ঠি দেখলেই কেবল বোঝা যায়।

মেসোমশাই বলতেন আরে সে-কপালের কথা আমি বলছি না। এই কপাল—এই কপাল-বলে তিনি নিজের কপালটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখাতেন। বলতেন—এই কপাল, এই কপালের কথা বলছি। মেয়ের কপালটা কি উঁচু, না থ্যাবড়া?

—থ্যাবড়া মানে?

মেসোমশাই রেগে যেতেন। বলতেন-বাঙালীর ছেলে হয়ে তুমি বাংলা ভাষাটাও বোঝো না? তাও তোমাকে আমায় শিখিয়ে দিতে হবে? কপালটা টেপা, না উটের পিঠের মত টিপিওয়ালা?

তবু বরদা ঘটক বুঝতে পারে না। আর বুঝতে পারলেও সেটা মনে ছিল না। মানে সেটা ভালো করে লক্ষ্য করেনি।

—আর ভুরু? ভুরুটা জোড়া, না দু' ফাঁক?

এবারও বরদা ঘটক নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করলে। বললে—আমি অতটা লক্ষ্য করিনি চক্কোত্তি মশাই। তাহলে আবার একবার পাত্রীকে দেখে আসি গিয়ে—

—হ্যাঁ, দেখে এসো।

এই কথা শুনেই বরদা ঘটক বললে—তাহলে আরো পাঁচটা টাকা দিন, যাতায়াতের খরচটা

মেসোমশাই তাই-ই এনে দিলেন বরদা ঘটকের হাতে। বরদা ঘটক টাকা পাঁচটা নিয়েই বিদায় নিলে।

প্রথমত, কপাল, তার পর জোড়া ভুরু। তার সঙ্গে গায়ের দুধে-আলতা রং। এতগুলো গুণ একসঙ্গে একটা আধারে পাওয়া সোজা কথা নয়। তবু যে-ঘটকের নাম বরদা তার অসাধ্য কাজ কিছু নেই। সে সাতদিনের মধ্যেই সুখবর নিয়ে হাজির।

বললে—হ্যাঁ চক্কোত্তিমশাই, আপনি যা বলেছেন, এও তাই-ই—

—কী রকম?

বরদা ঘটক বললে—এরও জোড়া ভুরু, এরও টেপা কপাল, এরও

গায়ের রং দুধে-আলতা। আমি গিয়ে আবার পাত্রীকে স্বচক্ষে দেখে এসেছি—

মেসোমশাই বললেন—আর হাইট কতো?

বরদা ঘটক বুঝতে পারলে না। বললে—হাইট? হাইট মানে?

—হাইট মানে লম্বায় ক' ফুট?

বরদা ঘটক তা দেখেনি। বড় বিপদে পড়লো সে। বললে—সেটা তো মেপে আসিনি চক্কোত্তিমশাই—

মেসোমশাই বললেন—তা সেইটেই তো আগে দেখে আসা দরকার। তুমি আসল কথাটাই ভুলে গেলে।

বরদা ঘটক বললে—আপনি তো শুধু পাত্রীর জোড়া ভুরু, চোখ কপাল আর গায়ের রং-এর কথা বলে দিয়েছিলেন। আমি তাই-ই দেখে এসেছি—হাইটের কথা তো বলেননি তখন?

মেসোমশাই রেগে উঠলেন। বললেন—তা তোমার নিজের একটা 'কমোন-সেন্স' নেই? মানে যাকে বলে সাধারণ বুদ্ধি, তা নেই? এই জন্যেই তো তোমার কিস্যু হলো না? চিরকাল এমনি রয়ে গেলে।

মাসিমা রান্না করতে করতে ছুটে এলেন। বললেন—কী হলো? অতো বকছো কেন ওকে? ও কী করেছে?

মেসোমশাই বললেন—ছাখ না, জোড়া-ভুরু, টেপা কপাল, চোখ, আর গায়ের রং দেখে আসতে বলেছি, ও সেইটেই দেখে এসেছে। আর এখন যেই পাত্রীর হাইটের কথা জিজ্ঞেস করছি, তখন বলছে—আমি তো হাইটের কথা দেখে আসতে বলিনি। আরে, তুমি পাকা ঘটক। তিন-পুরুষ ধরে ঘটকালি করে আসছো আর হাইটের কথাটাও কি আমাকে বলে দিতে হবে? তোমার নিজের একটা কমোন-সেন্স নেই? মানে, সাধারণ বুদ্ধি নেই—

মাসিমাও বুঝতে পারলেন দোষটা বরদা ঘটকেরই। সে খবরটা তার প্রথমেই জোগাড় করা উচিত ছিল। বললেন—যাক্ গে, যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। এখন তো শুনলে বাবা, মেয়ে কতখানি লম্বা জেনে আসতে হবে—

—তাহলে দিন আরো পাঁচটা টাকা—

মেসোমশাই বললেন—এক একবার এক-একটা খবর নিয়ে আসবে আর আমার পকেট থেকে পাঁচ টাকা করে গুণোগার দিতে হবে—

বলে বিরক্ত হয়ে আরো পাঁচটা টাকা দিয়ে দিলেন বরদা ঘটককে। বরদা ঘটক টাকা পাঁচটা নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর তার দু-তিন দিন পরেই খবর নিয়ে এল যে লম্বায় পাত্রী চার ফুট দশ ইঞ্চি মাত্র।

খবরটা আসতেই এক-কথায় সম্বন্ধটা নাকচ হয়ে গেল।

কিন্তু বরদা ঘটক দ্বিতীয়বার আর সে ভুল করলো না। এবার এলো অন্য একটি পাত্রীর খবব নিয়ে। এ-পাত্রীর টেপা কপাল, জোড়া ভুরু, সুন্দর চোখ, দুধে-আলতা গায়ের রং। যেমন-যেমন মেসোমশাই চেয়েছিলেন ঠিক তেমনি। হাইটও পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি। যেমন সুজয় চেয়েছিল ঠিক সেই মতোন।

বরদা ঘটক নিজেই মেসোমশাইকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল সেই বেহালায়। বেহালার নাম শুনে মেসোমশাই প্রথমে নাক শিঁটকেছিলেন।

বরদা ঘটক বললে—না চক্কোত্তি মশাই, এখনকার বেহালা আর সে-বেহালা নেই, এখন আপনাদেব কালিঘাটের চেয়ে ভালো হয়ে গেছে। এখন গেলে মনে হবে এ কোথায় এলুম। চৌরঙ্গী না ভবানীপুর? কয়েক বছর পরে চৌরঙ্গীর চেয়েও জায়গাটা ভালো হয়ে যাবে।

আর তা ছাড়া বেহালার মেয়েকেই তো তিনি নিয়ে আসছেন পুত্রবধূ করে। নিজের মেয়েকে তো আর তিনি বিয়ে দিচ্ছেন না সে-পাড়ায়।

তা বরদা ঘটক মিথ্যে কথা বলবার লোক নয়। যা-যা সে আগে বলেছিল তাই-ই ঠিক। টেপা কপাল, জোড়া ভুরু, সুন্দর চোখ, গায়ের বং দুধে আলতা ফর্সা। লম্বাতেও বোধহয় পাঁচ ফুট দু ইঞ্চির মতোন। অর্থাৎ সুজয় যা-যা চায়—ঠিক সেই রকমই—

বসন্তও মেসোমশাই-এর সঙ্গে গিয়েছিল।

প্রথমে জলযোগ হলো। পাত্রীর বাবাও সজ্জন ভদ্রলোক।

ভদ্রতার আদর্শ। বললেন—এইটেই আমার জীবনের শেষ কাজ। এই কাজটি হয়ে গেলেই আমি একেবারে মুক্তপুরুষ।

তারপর একটু থেমে বললেন—এবার দেনা-পাওনা সম্বন্ধে আপনাদের যদি কিছু বক্তব্য থাকে তা সেটা বলুন!

মেসোমশাই বললেন—দেনা-পাওনা সম্বন্ধে আমাদের কোনও দাবী নেই। আপনার মেয়েকে আমরা ঘরে নিয়ে যাবো, আপনার মেয়ে আমাদের গৃহলক্ষ্মী হবে, এর ওপর দেনা-পাওনা সম্বন্ধে আর কী-ই বা কথা থাকতে পারে!

মেয়ের বাপ কথাটা শুনে খুশী হলেন। মেসোমশাইও শেষ কালে যা বলতে হয় তাই-ই বললেন—আমরা আপনাকে পরে খবর জানাবো—

সঙ্গে বরদা ঘটক ছিল। তারই ঠিক করা সম্বন্ধ। রাস্তায় বেরিয়ে সে জিজ্ঞেস করলে—তাহলে এই পাত্রী পছন্দ তো আপনার?

মেসোমশাই বললেন—হ্যাঁ, এইখানেই আমি সুজয়ের বিয়ে দেব—

তারপর বসন্তর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন—কী বলো বাবা, সুজয় যা-যা চায় সবই তো মিলে গেল। তোমার কি রকম লাগলো?

বসন্ত বললে—সবই অবশ্য মিলে গেছে। কিন্তু একটা ব্যাপারে শুধু খটকা লাগছে।

মেসোমশাই জিজ্ঞেস করলেন—কীসের খটকা?

বসন্ত বললে—পাত্রী ম্যাট্রিক পাশ করেনি। এতে কি সুজয় রাজি হবে?

মেসোমশাই বললেন—ম্যাট্রিক পাশ না করলে ক্ষতি কী? তোমার মাসিমাও তো ম্যাট্রিক পাশ করেনি, তাতে আমার কি কিছু ক্ষতি হয়েছে? যত সব···

বাকি মন্তব্যটা আর মুখে উচ্চারণ করলেন না মেসোমশাই।

সন্ধ্যেবেলাই সুজয় বসন্তর বাড়িতে গিয়ে হাজির। ছাত্রীদের পড়িয়েই সোজা গিয়ে হাজির হয়েছে সে। জিজ্ঞেস করলে—কী রে, দেখলি?

বসন্ত বললে—হ্যাঁ—

—পছন্দ হয়েছে তোর ? হাইট্ কতো ?

বসন্ত বললে—পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি।

গায়ের রং ? দুধে-আলতা তো ?

বসন্ত বললে হ্যাঁ। যেমন তুই চাস্, ঠিক তেমনি।

—আর ভুরু ? জোড়া না দু ফাঁক ?

—জোড়া। সেদিক থেকে কোনও খুঁত নেই।

সুজয় আবার জিজ্ঞেস করলে—চোখ দুটো কেমন ? বেশ স্বপ্নালু-স্বপ্নালু তো ?

—হ্যাঁ।

—সুজয় বললে—তাহলে তো নিখুঁত মেয়েই বলতে হবে। বাবা দেখে কী বললেন ?

বসন্ত বললে—মেসোমশাই-এর তো খুব পছন্দ হয়েছে -

—আর তোর ?

বসন্ত বললে—আমার পছন্দ হয়নি।

— কেন ? খুঁত আছে কিছু ?

বসন্ত বললে—ম্যাট্রিকটা পাশ নয় !

—ম্যাট্রিক পাশ নয় ?

বসন্ত বললে—মেসোমশাইকে আমি কথাটা বললুম। কিন্তু মেসোমশাই বললেন, তোমার মাসিমা তো ম্যাট্রিক পাশ নয়, তাতে কি তাঁর কোনও অসুবিধে হয়েছে ? কথাটা শুনে মেসোমশাই তো হেসেই উড়িয়ে দিলেন ··

সুজয় একটু ভাবনায় পড়লো। ম্যাট্রিক পাশ না-করা মেয়েকে কী করে বউ করে আনা যায় ! মুখে বললে—তা সে যুগ আর এ-যুগ ? সে-যুগে তো কোনও মেয়েই ইস্কুলে পড়তো না। কিন্তু এ-যুগে ? হঠাৎ যদি বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম আসে তো কী করে জানবে তাতে কী লেখা আছে ? আমি যতক্ষণ না অফিস থেকে আসবো ততক্ষণ তো কেউই কিছু জানতে পারবে না কে টেলিগ্রাম করেছে, কেন টেলিগ্রাম

করেছে। তখন কী হবে ভেবে দেখ।

তারপর একটু ভেবে বললে—আর তা ছাড়া আরও একটা কথা। তাকে নিয়ে যদি আমি ইংরিজী সিনেমা দেখতে যাই তো সে তো কিছুই বুঝতে পারবে না। আমাকেই পাশে বসে লাইন-বাই-লাইন বাঙলায় তর্জমা করে বুঝিয়ে দিতে হবে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। আশে-পাশের লোকগুলো তখন কী ভাববে বল্‌তো। বলবে—এ মা, এর বউটা ইংরিজী জানে না—

বসন্ত বুঝলো যে সুজয়ের কথাটা যুক্তিসঙ্গত।

সুজয় বললে—তাছাড়া আরো একটা কথা ভাববার আছে। সেটা এই যে আমি যাদের পড়াই সেই স্টুডেন্টরা কী ভাববে বল্ দিকিনি। ভাববে মাস্টারমশাই আমাদের থার্ড-ইয়ারের মেয়েদের পড়ায় আর মাস্টারমশাই-এর নিজের বউই কিনা নন্ ম্যাট্রিক! তখনকার অবস্থাটা আমার কী রকম হবে, ভাব্ তুই একবার।

বসন্ত আর কী বলবে! বললে—তুই ঠিকই বলেছিস। আমি তো তাই-ই মেসোমশাইকে তখনই বলে দিলুম। বললুম—সুজয় কখনও এ-মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হবে না—

তারপর সুজয় বাড়িতে যেতেই বাবা বললেন—তুমি বোধহয় বসন্তর কাছে সব শুনেছ—

সুজয় বললে—হ্যাঁ, শুনলুম সব। আমার পক্ষে ওখানে বিয়ে করা অসম্ভব!

মা বললে—তাহলে কী হবে? এতগুলো মেয়ে দেখা হলো কোনওটাই তো তোমার মনোমত হলো না। তাহলে আমরা কী করবো?

সুজয় বললে—তোমরা আর কী করবে। না-হয় আমি বিয়েই করবো না, তা বলে কানা-খোঁড়া যাকে সামনে পাবে তাকেই আমাকে বিয়ে করতে হবে?

বাবা বললেন—কানা-খোঁড়ার কথা বলছো কেন? আমরা কি তোমার জন্যে কানা-খোঁড়া মেয়ে দেখে বিয়ে দিচ্ছি? আমরা কি

ভালো সুন্দরী বউ ঘরে আনতে চাই না ?

সুজয় বললে—তাহলে বরদা ঘটক এ-পাত্রীর সন্ধান আনে কেন ? লেখা-পড়া জানা চাই, এটা তো প্রথম কনডিশন্। তার পরে অন্য সব—

বাবা বললেন—তাহলে তোমার অন্য কন্‌ডিশনগুলো আগে আমাদের বলে দাও নইলে শেষকালে হয়তো আবার কোনও ফ্যাকড়া বেরোবে—

সুজয় বললে—কতো বার বলবো। এতো বার বললেও যদি তোমাদের মনে না থাকে তাহলে আমার কী দোষ '

বাবা বললেন—তাহলে দাঁড়ালো এই যে, প্রথমে জোড়া ভুরু, দু' নম্বর হলো স্বপ্নালু চোখ, তিন নম্বর হচ্ছে দুধে-আলতা গায়ের রং। চার নম্বর হচ্ছে মিনিমাম ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। পাঁচ নম্বর হচ্ছে···

সুজয় বললে—আর পাঁচ নম্বর নেই। ওই চারটে হলেই চলবে—তারপর এখন আর কিছু মনে পড়ছে না, মনে পড়লে পরে জানাবো। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা—

শেষ পর্যন্ত তাই-ই ঠিক হলো। বরদা ঘটককেও সেই কথাই বলে দেওয়া হলো। এই চারটে পয়েণ্ট ঠিকমতো দেখালে তবে যেন সে মেয়ে দেখাবার আয়োজন করে। নইলে কষ্ট দেবার দরকার নেই।

তাই বলছিলাম—শেষ পর্যন্ত সে এলো।

অথচ কতো বছর আগেই তো তার আসার কথা। আমার আত্মীয় স্বজন সবাই-ই তো আশা করেছিল একদিন সে আসবে ! আমাদের সংসার আলো করে দেবে সে এসে।

কিন্তু আমার মনে হলো সে না এসে যেন তখন ভালোই করেছিল। সেদিন সে এলে তো বুঝতেই পারতুম না আমাদের দেশে আমরা কত অন্যায়, কত অবিচার, কতো অত্যাচারের মধ্যে বাস করছি। কত ঘুষ, কত কালো টাকা, কত হিংসে আমাদের গ্রাস করে চলেছে।

আশা করা এক জিনিস আর তা পূরণ বা না-পূরণ হওয়া আর এক জিনিস।

সেই সুজয় আগে কতো অন্য রকম ছিল। জামা-প্যান্ট-শার্ট নিয়ে কতো খুঁতখুতে ছিল। মাথার চুলের স্টাইল নিয়েই বা তার কত ভাবনা-চিন্তা ছিল। মেয়েদের মন আকর্ষণ করবার জন্যে কত রকমের প্ল্যান তার মাথায় ঘোরাফেরা করতো। ঘরের দেওয়ালে কত সিনেমা অ্যাকটর অ্যাকট্রেসের ছবি টাঙিয়ে রাখতো।

কিন্তু তখন সে-সব কেন করতো সে? কেন সাধারণ হতে পারতো না সে?

আসলে অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে হওয়ায় শহরে আসবার সুযোগ পেয়েছিল—এইটেই ছিল তার এক বড় কারণ। পাড়াগাঁয়ে জন্ম হওয়ার দুর্ভাগ্যে মানসিক দিক থেকে সে খুব লজ্জিত থাকতো। সব সময়ে তার ভয় হতো এই বুঝি লোকে জানতে পেরে গেল যে সে গেঁয়ো ছেলে। এই বুঝি লোকে জানতে পেরে গেল যে সে অসভ্য। তাই নিজেকে সভ্য মানুষ হিসেবে প্রমাণ করবার জন্যে সে এমন উঠে পড়ে লেগে গেল এমন আচরণ করতে লাগলো যাতে লোকে জানতে পারে যে কলকাতা শহরেই তার জন্ম।

তখনকার দিনে কলকাতা শহরের ছেলেরা গ্রামের ছেলেদের সবাই একটু নিচু নজরে দেখতো। তাদের একমাত্র অপরাধ ছিল এই যে তারা গাঁয়ের লোক। তাই গাঁয়ের ছেলেরাও কলকাতায় এসে কলকাতার ছেলেদের সব ব্যাপারে হাবে-ভাবে চাল চলনে পোষাকে পরিচ্ছদে টেক্কা দিতে চাইতো। সুজয়ও মনে মনে তাই চাইতো। তার পোষাক পরিচ্ছদ, তার সিগারেট খাওয়ার ভঙ্গী তার ইংরেজী সিনেমা দেখা, তার এই সুন্দরী রূপসী মেয়ে বিয়ে করার ইচ্ছের পিছনেও ছিল তার সেই মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ।

তখনকার দিনে মধ্যবিত্ত মানুষরা যতটা সম্ভব খরচপত্রের ব্যাপারে হিসেব করে চলতো। সস্তা টুথ-পেস্ট দিয়ে দাঁত মাজলে আমাদের তেমন লজ্জা করতো না। কিন্তু সে ব্যাপারেও সে সব চেয়ে দামী টুথ-পেস্ট ব্যবহার করে আমাদের হারিয়ে দিতে চাইতো।

বলতো—জানিস, আমি 'বিনাকা' টুথ-পেস্ট দিয়ে দাঁত মাজি—

'বিনাকা'! 'বিনাকা' কী টুথ-পেস্ট?

সুজয় বলতো—'বিনাকা' টুথ-পেস্টের নামই শুনিসনি তুই? সে কী রে? শুনলে লোকে যে তোকে বাঙাল বলবে রে?

আমি জিজ্ঞেস করতাম—কত দাম?

সুজয় বিজয়ীর মতো সগর্বে বলতো—সাড়ে তিন টাকা। একেবারে মেড্ ইন্ ইংল্যাণ্ড—

আমাদের দৌড় তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের পাঁচসিকে দামের টুথ-পেস্ট পর্যন্ত। তার চেয়ে দামী টুথ পেস্ট ব্যবহার করার সাধ্য থাক আর না থাক, ইচ্ছেটাও ছিল না আমাদের।

আর শুধু যে সামান্য টুথ-পেস্ট, তা নয়, সব ব্যাপারেই সে আমাদের টেক্কা দিতে লাগলো। স্নো-ক্রীম-পাউডার আমরা কলকাতার ছেলে হয়েও জীবনে ব্যবহার করেছি কি না সন্দেহ।

সুজয় জিজ্ঞেস করতো—কতো টাকা পাউণ্ডের চা খাস তোরা?

আমি চা খাই না শুনে সে-ই যেন লজ্জায় নুয়ে পড়তো। আমার চা না-খাওয়াটা যেন তাব নিজের অপরাধ।

বলতো—সে কী রে, তুই চা-ই খাস্ না?

আমার কথা শুনে তার লজ্জার যেন আর অন্ত থাকতো না। বলতো কাউকে যেন বলিসনি এ-কথা। যা বললি তা আর কাউকে যেন বলিসনি। তাহলে লোকে তোকে বাঙাল বলবে!

অথচ তাদের আর্থিক অবস্থা আমার অজানা ছিল না। গ্রামের মানুষ তার বাবা আশুতোষ চক্রবর্তী অতি বিনয়ী এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ। তবে পৈতৃক অগাধ টাকার মালিক। গ্রামে প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারি করে জীবন কাটিয়েছেন। সততা আর ভদ্রতার আজীবন অনুরাগী। জীবনে কাউকে কখনও কড়া কথা বলেননি। ছাত্র-মহলে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। দেশ থেকে চলে আসবার সময় গ্রামবাসীরা সবাই একযোগে তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানিয়েছিল আর একটা মানপত্রও দিয়েছিল।

এ হেন মানুষের ছেলে সুজয় কলকাতায় এসে এমন করে কট্টর

শশুরে হয়ে যাবে এ কথা তিনি কখনও কল্পনাও করতে পারেননি। যে আশুতোষ চক্রবর্তী এবং তাঁর স্ত্রী বাড়িতে কখনও চা-ও প্রবেশ করতে দেননি, সেই তাঁরই ছেলে সুজয় কি না বাড়িতে চা-পর্বও ঢোকালো। সুজয়ের টাকাতেই সংসার চলছে যখন, তখন তার সাধ-আহ্লাদ, সখ-সৌখিনতার কদর তো করতেই হবে। সুজয়ের সাধ-আহ্লাদ, সখ-সৌখিনতার বহর দিন দিন বাড়তেই লাগলো। যে শার্ট সে একদিন পরবে পরের দিন তা লণ্ড্রিতে ইস্ত্রী করবার জন্যে পাঠাতেই হবে। যে মানুষ গ্রামে বেশির ভাগ দিনই খালি পায়ে হাঁটাচলা করছে, সেই ছেলের পায়েই আবার 'অ্যালবার্ট'-শু' উঠলো। আবার প্রতিদিন সে জুতোয় 'শু-শাইন্' পালিশ করার নিয়ম বহাল হলো। সকালবেলা ঘুম ভাঙবার আগে মুখের কাছে গরম চা-এর কাপ দিয়ে আসা বাধ্যতা-মূলক হলো। গা-মোছার জন্যে গামছার বদলে তোয়ালে ব্যবহার অনিবার্য হয়ে উঠলো। গায়ে মাখার জন্যে সরষের তেলের বদলে শুরু হলো গ্লিসারিন সাবান মাখা। মাথার চুলে মাখবার জন্যে শুরু হলো বিলিতি হেয়ার-অয়েল আর রবিবার দিনটায় চান করবার সময় শ্যাম্পু হয়ে উঠলো অনিবার্য।

এই সব পরিবর্তনের পেছনে সহযোগিতা করতে লাগলো তার রেলের অফিসের মোটা মাইনের অঙ্কের আনুকূল্যটা। চাকরিতে সুজয়ের যতো প্রমোশন হয় ততো তার প্রয়োজনের পরিধি বাড়ে। বাড়তে বাড়তে তা একেবারে বনেদিয়ানার শিখরে গিয়ে ঠেকলো—যার ধারে কাছেও আমাদের মতো অভাজনরা পৌঁছোতে পারলাম না।

সুজয় বলতে লাগলো—আমাদের মতো তোরাও ইংরেজী সিনেমা দেখ, ইংরিজী খবরের কাগজ পড়, ইংরেজদের ফলো করে চল্, তাহলে তোরাও আমার মতো হতে পারবি!

তখন ইংরেজ আমল। সে-আমলের পক্ষে তার কথাগুলো যুক্তি-যুক্ত বলেই আমাদের মনে হতো।

কিন্তু বিয়ে?

বিয়ের সঙ্গে তো ইংরেজীআনার কোনও সম্পর্ক নেই। সে যতোই

মেমসাহেবদের ছবি দেওয়ালে টাঙাক, যতোই অফিসের ইংরেজ-সাহেবদের কৃপাকণা পাক, বিয়ে তো সেই করতে হবে ডাল-ভাত-শাক-চচ্চড়ি খাওয়া বাঙালী মেয়েকেই। সেখানে তো তার ইংরেজীআনার কদর কেউ দেবে না।

সুঞ্জয় বলতো—দেখবি আমি এমন এক মেয়েকে পছন্দ করে বউ করবো যে আমার এই রিফাইণ্ড টেস্টের কদর বুঝবে। যার টেস্টের সঙ্গে আমার টেস্টের রাজযোটক মিল হবে। মার্লিন ডিয়েট্রিচ্, মেরী পিক্ফোর্ড, মেরিলীন্ মনরো, লিলিয়ান গিশ্ নাই বা হলো, তাদের ইণ্ডিয়ান এডিশন হলেই হলো—! তোরা কি ভাবিস তেমন মেয়ে কলকাতায় নেই, তেমন মেয়ে কলকাতায় পাওয়া যাবে না? ছাখ্, খুঁজলে কী-ই না পাওয়া যায়?

আগের মতো তখনও সেই রকম মেয়ের খোঁজ-খবর খুব ঘটা করে চলতে লাগলো।

আশুবাবু শেষকালে বিরক্ত হয়ে বরদা ঘটককে বলে দিলেন—পাত্রী দেখতে যাওয়ার আগে পাত্রীর ফটো এনে দেখাতে। ফটো দেখে যদি ছেলের পছন্দ হয় তখনই পাত্রীকে চাক্ষুষ দেখতে যাবো। নইলে মজুরী পোষাবে না, এই কথাটা মনে রেখো—

বরদা ঘটক তাই-ই করলে। তখন থেকে সে সব সম্ভাব্য পাত্রীদের ফটো আনতে লাগলো। ফটোগুলো আনবার পরে প্রথমে মেসোমশাই দেখলেন। তারপর সেটা দেখালেন মাসিমাকে। মাসিমা বরাবরই কম কথার মানুষ। এক-একটা ফটো দেখেন আর বলেন—আমি আর কী বুঝবো? তুমি যা ভালো বুঝবে তাই-ই করবে—

মেসোমশাই বলেন—আরে, আমি সেকালের মানুষ, আমার পছন্দ তো সেকেলে পছন্দ। আমার পছন্দের সঙ্গে কি তোমার ছেলের পছন্দ মিলবে?

মাসিমা বলতো—তাহলে সুঞ্জয়কে দেখাও, সে পছন্দ না করলে তো বিয়ে হবে না, আমাদের পছন্দের কোনও দাম নেই তার কাছে—

তা সত্যি। তাই সুঞ্জয়কেও দেখানো হতে লাগলো সব ফটো-

গুলো। সুজয় একটা ছবি দেখে আর বলে—না, এ পাত্রী চলবে না—

বাবা বলেন—কেন রে? এর কী দোষ হলো?

সুজয় বলে—না, এ মেয়েটা ঘোড়ামুখো—

—ঘোড়ামুখো? তার মানে?

সুজয় বলে—ঘোড়ামুখো মানে ঘোড়ার মতন মুখ। দেখছো না, নাক আর ঠোঁটদুটো কেমন সামনের দিকে তোলা?

ছেলের কথার ওপর কথা বলা মেসোমশাই-এর সাজে না। বলতে গেলে সুজয়ই এই সংসারের হাল ধরে সেটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তার কথা বাবা-মা মেনে চলতে বাধ্য! হাজার হোক ছেলে রোজগারি যে।

তাই সে পাত্রী বাতিল।

তা বরদা ঘটক হেরে যাওয়ার পাত্র নয়। সে আরোও পাত্রীর ছবি সংগ্রহ করে আনে। আর তার জন্যে দু'হাত পেতে খরচ-খরচাও নেয়।

বলে—ঠিক আছে চক্কোত্তিমশাই, আমি আরো এক পাত্রীর ছবি আনবো, এবার ঠিক পছন্দ হবে আপনার ছেলের।

কিন্তু সেবারও সেই একই যুক্তিতে পাত্রীর ছবি পরিত্যক্ত হলো।

একদিন বসন্তের সঙ্গে দেখা হলো রাস্তায়। জিজ্ঞেস করলাম—কী রে, সুজয়ের বিয়েব কিছু ঠিক হলো?

বসন্ত বললে—কী করে হবে? এমন ধনুক-ভাঙা পণ করলে কখনও কারো বিয়ে হয়?

বললাম তাহলে বাঙলা খবরের কাগজে 'পাত্রী চাই' কলমে বিজ্ঞাপন দিতে বল্ না। ওতে আনেক সস্তায় কাজ হাসিল হবে। ঘটককেও তো এখন অনেক টাকা দিতে হয় সেটা বেঁচে যাবে?

বসন্ত বললে—এবার তাই-ই ঠিক করেছে সুজয়—তুই তো সাহিত্যিক মানুষ, তুই একটা ড্র্যাফট করে দে না—

তারপর আমিই একটা ড্র্যাফট্ করে দিলাম। লিখলাম "বিবাহেচ্ছুক ব্রাহ্মণ পাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরীরত। মাসিক

আয় পাঁচ শত টাকা। প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। পোঃ বঃ ইত্যাদি ইত্যাদি..."

বসন্ত সেই ড্র্যাফট নিয়ে সুজয়কে দেখালো। সুজয় সেটা অদল-বদল করে দিল। বললে—"প্রকৃত সুন্দরী" কথাটার মানে কী? ওখানে অন্য শব্দ বসাতে হবে?

বলে সে শব্দটা বদল করে দিলে 'একমাত্র প্রকৃত সুন্দরী পাত্রীই বিবেচ্য। কোনও দাবী নাই। আমি শুনলাম সব। কিন্তু কিছু মনে করলাম না। সংসারে কত রকম পাগলই তো থাকে। তা নিয়ে মাথা ঘামালে মানুষের চলবে না। এও একরকমের পাগলামি। শেষ পর্যন্ত সেই সংশোধিত বিজ্ঞাপনই পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়ে বেরোল। সে বিজ্ঞাপনে কাজও হলো। মেসোমশাই-ই সে সব চিঠিপত্র নিয়ে পত্রালাপ করতে লাগলেন। সুজয় সোজা জানিয়ে দিলে যে প্রাথমিক পর্বটা বাবাই সমাধা করবেন। প্রথম পর্বের বাছাই-এর পর চূড়ান্ত পর্বে সুজয় নিজে গিয়ে পাত্রীকে দেখবে। তখন যদি পাত্রী পছন্দ হয় তো তখনই বিয়ে হওয়ার কথা উঠবে। তার আগে নয়।

তখন থেকে সেই প্রথম পর্বেই বুড়ো বাবার হয়রানির আর অন্ত রইল না। কোথায় কস্‌বা, কোথায় আসানসোল, কোথায় নব-বারাকপুর, কোথায় নদীয়া, কোথায় টালিগঞ্জ। শুধু যে শারীরিক হয়রানি তা নয়, তার সঙ্গে অর্থ নষ্ট হতে লাগলো প্রচুর। সঙ্গে থাকে বসন্ত। বুড়ো মানুষটাকে সব জায়গায় একলা ছাড়া যায় না, একজন জোয়ান মানুষ থাকলে তবুও একটু অভয় পাওয়া যায়। কিন্তু কোথাও তেমন পাত্রী মিললো না যেমন সুজয় চায়।

সব জায়গা থেকেই আশুবাবু আর বসন্তকে হতাশ হয়ে ফিরতে হলো। বাড়িতে মাসীমা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন।

আশুবাবু বাড়িতে ফিরলেই জিজ্ঞেস করেন—কেমন দেখলে? পছন্দ হলো?

আশুবাবু হতাশার ভঙ্গিতে বলেন—না—

বসন্ত সুজয়কেও তাই বলে। বলে—না হলো না। জোড়া ভ্রূ

হলো না, গায়ের রংটা দুধে আলতা বটে, যেমন তুই চেয়েছিলি। কিন্তু জোড়া ভুরু মিললো না।

একটা লক্ষণ মেলে তো অন্য লক্ষণগুলো মেলে না। সুজয়ের কী যে এক ধনুক-ভ ঙা পণ। কোথাওই পৃথিবীর কোনও মেয়েই সুজয়ের চাহিদা মতো পাওয়া গেল না।

বসন্ত বললে—তা হলে কী হবে ?

সুজয় বললে—তাহলে আমি বিয়েই করবো না। বিয়ে না করলে কী এমন ক্ষতি হয় মানুষের ? বিয়েটা তো একটা সংস্কার—

শেষকালে হঠাৎ এক জায়গায় সেই সুজয়ের পছন্দ মতো একটা পাত্রী পাওয়া গেল।

সুজয় বসন্তকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে—ভালো করে মন দিয়ে পাত্রীকে দেখেছিস তো ?

বসন্ত বললে—হ্যাঁ জোড়া ভুরু, দুধে-আলতা গায়ের রং, ম্যাট্রিক পাশ, আই এ সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছে।

আর চোখ ?

—যেমন—চোখ তুই চাস্। ঠিক তেমনি।

সুজয় বললে—মার্লিন ডিয়েট্রিচের মতোন চোখ ?

বসন্ত বললে—হ্যাঁ, অনেকটা সেই রকম।

—আর স্বাস্থ্য ?

—স্বাস্থ্য ও ভালো তবে মাথার চুলটা একটু কম কম মনে হলো।

বলেই বললে—দ্যাখ্, এখানে তুই আপত্তি করিসনি। এ মেয়েকে রিজেক্ট করলে তোকে পস্তাতে হবে, তা বলে রাখছি –

সুজয় কোনও কথা না বলে চুপ করে রইলো।

চুপ করে কথাটা সম্মতির লক্ষণ বলে মনে করে বসন্ত মেসোমশাইকে গিয়েও সেই কথা বললে।

মেসোমশাইও কথাটা শুনে খুব খুশী হলেন। বললেন—সুজয় তাহলে পছন্দ করেছে এই পাত্রীকে ? যাক্, বাঁচা গেল।

বসন্ত বললে হ্যাঁ, আমি বলেছি যে এ পাত্রীকে অপছন্দ করলে

তাকে পরে পস্তাতে হবে! তাই রাজি হয়ে গেছে সুজয়। আর কোনও কথা বলেনি।

মাসিমাও কথাটা শুনে খুশি হলো, সেই দিনই কালিঘাটের মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে এলো মাসিমা। মাকে গিয়ে প্রার্থনা করলে—হে মা কালী, যেন ভালোয় ভালোয় শুভকাজটা শেষ হয়—আর যেন কোনও বাধা না আসে!

আশুবাবু পাত্রীপক্ষকে বসন্তর মারফৎ খবর পাঠিয়ে দিলেন যে পাত্রপক্ষের পছন্দ হয়েছে। দাবী দাওয়া কিছু নেই। শুধু দিন স্থির করার প্রশ্নটা ঠিক হবে পুরোহিতমশাই-এর কথায়।

শেষ পর্যন্ত একটা দিন স্থির হয়ে গেল। দু'পক্ষই শুভ বিবাহের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে লাগলো।

বসন্ত দু'পক্ষের বার্তাবহ হয়ে কাজ করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত চিঠিও ছাপা হয়ে যারা দূরের আত্মীয়স্বজন তাদের পাঠানো হয়ে গেলো। জিনিসপত্র কেনা-কাটা শুরু হয়ে গেল দু পক্ষ থেকেই।

যারা খুব দূরে থাকে তাদের মধ্যে একজন এসে হাজিরও হয়ে গেলেন। বাড়ি তখন আত্মীয় স্বজনে প্রায় জমজমাট।

সুজয় হঠাৎ একদিন বসন্তর বাড়িতে গিয়ে হাজির।

বসন্তর তখনও ভালো করে ঘুমটা ভাঙেনি।

সে সেই অসময়ে সুজয়কে দেখে অবাক!

বললে—কী রে, তুই? তুই এই সকালে?

সুজয় বললে—রাত্তিরে খুব ভালো ঘুম হয়নি ভাই।

—কেন? আবার কী হলো?

সুজয় বললে—ভাই, পাত্রীকে আমি একবারও দেখলুম না, অথচ বিয়ের সব কিছু পাকা হয়ে গেছে। একবার বিয়ের আগে আর একবার দেখা যায় না?

বসন্ত বললে—সে কীরে? এখন যে সব পাকা হয়ে গিয়েছে। বিয়ের চিঠি পর্যন্ত ছাপা হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে লোক-জন আত্মীয়-কুটুম অনেকেই দূর দূর থেকে এসেছে। সবকিছু ঠিক হওয়ার পরে

এখন তুই যদি বিয়েটা নাকচ করে দিস তাহলে কী হবে সেটা একবার ভেবে ছাখ্ তো।

সুজয় বললে—আমি বিয়ে নাকচ করে দিচ্ছি, কে বললে? আমি শুধু একবার নিজের চোখে মেয়েকে দেখে নিতে চাই—। ভেবে ছাখ, সারা জীবন যাকে নিয়ে ঘর করতে হবে তাকে বিয়ে করার আগে একবার নিজের চোখে দেখে নিতে দোষ কী?

বসন্ত বললে—আমি তো নিজে দেখে তোকে সব কিছু বলেছি। তুই যা-যা চাস সব ঠিক ঠিক মিলে গেছে—

—কিন্তু তবু···জানিস কালকে রাত্তিরে ওই সব ভাবতে-ভাবতে মোটেই ঘুম এলো না···

বসন্ত বললে—এখন আর একবার দেখতে চাওয়া কি ভালো দেখাবে? ওদেরও তো একটা প্রেস্টিজ্ আছে...ওরা যদি আপত্তি করে তো তখন কী হবে?

সুজয় বললে—আপত্তি করবে কেন?

বসন্ত বললে আমার যদি এই রকম হতো তো আমি তো তাতে আপত্তি করতুম···আমি তাদের দেখতেই দিতুম না—

শেষকালে সুজয় কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো। বললে—ছাখ ভাই, আমি হলেও তা-ই করতুম। কিন্তু আমার অবস্থাটা একবার তুই বোঝ—কালকে সমস্ত রাত আমার এই সব ভেবে একেবারে ঘুমই হলো না। কেন হলো না তাই একবার ভাব—আমি শুধু শেষবারের মতো একবারটি দেখবো তারপর তোকে আর বিরক্ত করবো না—

অগত্যা বসন্তকে রাজি হতেই হলো। একান্ত বাধ্য হয়েই রাজি হতে হলো। আর কোনও উপায় ছিল না বলেই রাজি হতে হলো।

কিন্তু এ ব্যাপারে আশুবাবুকেও কিছু জানানো হল না, সুজয়ের মাকেও কিছু জানানো হলো না।

তাই একটা দিন স্থির করে বসন্ত সুজয়কে নিয়ে শেষবারের মতো পাত্রী দেখতে গেল।

তাই বলছিলাম—শেষ পর্যন্ত সে এলো।

অথচ কতো বছর আগেই তো তার আসার কথা স্থির ছিল। আমার আত্মীয়-স্বজন সবাই-ই তো আশা করেছিল একদিন সে আসবে। আমাদের সংসার আলো করে দেবে সে এসে। কিন্তু আমার মনে হলো সেদিন সে না এসে ভালোই করেছিল। সেদিন সে এলে তো বুঝতেই পারতুম না যে আমাদের দেশে আমরা কত অন্যায়, কত অবিচার, কত অত্যাচারের মধ্যে বাস করছি। কত ঘুষ, কত কালো টাকা, কত হিংসে আমাদের গ্রাস করে চলেছে।

সুজয়েব কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল সেই আগেকার সুজয়ের সঙ্গে এই আজকের সুজয়ের কত তফাৎ। অথচ সেদিন কি আমরা সে সব কল্পনা কবতে পেরেছিলাম! তখন তো কেবল তার নিজের জুতো-জামা-কাপড় আর মাথার চুলের স্টাইল নিয়েই ব্যস্ত থাকতো সে। আর ছিলো সিনেমা। তখন কলকাতায হলিউডের ইংরেজী সিনেমার যুগ বলে অন্য সকলের মতো সুজয়ও নিজের ঘরের দেওয়ালে বিলিতি অভিনেত্রীদের ছবি টাঙিয়ে রাখতো। এ সব অনেক দিন আগেকার কথা।

এখন সেই আগেকার কথাটাই বলি।

সেই জয়ন্তীর কথা। জয়ন্তী মুখার্জি। যে জয়ন্তী মুখার্জিকে দেখতে গিয়েছিল সুজয় আর বসন্ত।

বাড়িটা দোতলা। বসন্ত আগে একবার মেসোমশাই-এর সঙ্গে দেখতে গিয়েছিল ওই জয়ন্তী মুখার্জিকেই। ওই মেয়েকে পছন্দ হওয়ার পরই মাসিমা কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে মা-কালীকে পূজো দিয়ে এসেছিল।

কিন্তু পাত্রী যদি পছন্দই হয়ে গিয়ে থাকে তো আবার সে পাত্রীকে দেখার মানেটা কী?

সন্তোষবাবুর ওই একই মেয়ে। সন্তোষ মুখার্জি। তিনি সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে ওই মেয়েকে মানুষ করেছিলেন। ছাপোষা মানুষের পক্ষে সন্তান মানুষ করা সে যুগেও যেমন কষ্টকর ছিল এ যুগেও তেমনি।

হয়তো এ যুগে তা আরো কষ্টকর।

কিন্তু সন্তোষবাবুর নিজের ওই পৈত্রিক বাড়িটা ছাড়া স্থাবর সম্পত্তি আর কিছু ছিল না। অফিসের মাসকাবারি মাইনেটাই ছিল তাঁর একমাত্র ভরসা। যে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করবে সে যদি দীর্ঘায়ু হয় তো শেষ পর্যন্ত শ্বশুর-শাশুড়ীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে তার স্ত্রীই ওই বাড়িটার মালিক হবে। সেটাও একটা বাড়তি লাভ।

এ-সত্যটা সন্তোষবাবুর যেমন জানা ছিল, তেমনি জানা ছিল জয়ন্তীরও। ম্যাট্রিক পাশ করার আগে থেকেই সন্তোষবাবু মেয়ের বিয়ে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন।

জয়ন্তীর মা সেকালের মানুষ। ষষ্ঠি মানতো, ব্রত পূজো সবই মানতো। মেয়েকে দিয়ে কত রকমের ব্রত কথা পাঠ করাতো। মা বলতো—পুণ্যি-পুকুর ব্রতটা করবি আমার সঙ্গে, ভাল বর হবে তোর।

জয়ন্তী আপত্তি করতো। বলতো—আমি ও সব বুজরুকী-টুজরুকী মানি না—

মা বলতো—সে কী রে, ব্রত মানিস না? তোর কপালে দেখছি অনেক দুঃখু আছে—মুখপুড়ী—

জয়ন্তী বলতো—তুমি তো এত ব্রত-ফ্রতো করছে, তাতে তোমার কী লাভটা হয়েছে শুনি? কাঁচকলা লাভ হয়েছে—

মা বলতো—ওরে ওই রকম অলুক্ষণে কথা বলিস নে, ও কথা বললে পাপ হয়।

জয়ন্তী রেগে গিয়ে বলতো—হোক পাপ, কপালে যা আছে তা হবেই। ওই পূজো-আচ্চা করলেও যা হবে, পূজো আচ্চা না করলেও তাই হবে!

মা বলতো—পূজো আচ্চা করেছিলুম বলেই এই গ্যাখ্ না আমি কেমন তোর মতো মেয়ে পেয়েছি। তুইও যদি পূজো-আচ্চা করিস তো তোরও ভালো বর হবে, ভালো ছেলে মেয়ে হবে—

জয়ন্তী বলতো—বিয়ে না করলে কি চলে না? বিয়ে কি আমাকে করতেই হবে?

মা বলতো—ওমা, এ-সব কী কথা বলছিস তুই? এই সব বুদ্ধি কে তোর মাথায় ঢোকালে?

মেয়ের কথা শুনে বাবা সন্তোষবাবুও যেমন অবাক হতেন, তেমনি অবাক হয়ে যেতো মা-ও।

কিন্তু তা বলে হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না। তাই মা মেয়েকে নিয়ে ব্রত-পাঠ করাতো।

এ-সব সেই পুরনো আমলের কাহিনী। তখন একদিকে পৃথিবীতে দ্বিতীয়-যুদ্ধের হামলা চলছে। কলকাতা থেকে যখন সব মানুষ জাপানী বোমার আতঙ্কে বাইরের মফঃস্বলে পালিয়ে বাঁচছে, তখন কার ভরসায় বাড়ি ছেড়ে সন্তোষবাবু পালাবেন? আর পালাবেনই বা কোথায়? চাকরি তো ছেড়ে দিতে পারেন না। চাকরি ছেড়ে দিলে খাবেন কী? কে তাদের ভরণ-পোষণের ভার নেবে?

অফিসে গিয়ে কাজ করতে করতে লোকে নানা রকম গল্প করে।

শিববাবু বললেন—কলকাতার বাড়িগুলোর একটা ইট পর্যন্ত আস্ত থাক'ব না, এই আমি বলে দিলুম—

সবাই অবাক হয়ে যেত শিববাবুর কথা শুনে।

বলতো—তাহলে আপনি কলকাতায় পড়ে আছেন কেন? চাকরির মায়ায়?

শিববাবু বলতেন—আমার ফ্যামিলি তো আমার শ্বশুর-বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা কেউ কলকাতায় নেই। আমি তো এখন একটা মেসে থাকি।

সকলের তখন প্রায় সেই রকমই অবস্থা। যাদের ভয় নেই তারাই থেকে গেছে কলকাতায়। সকলের শ্বশুর-বাড়ি কি বাইরের গ্রামে? সে-রকম সৌভাগ্য ক'জনেরই বা হয়। কারো ছেলে থাকে পাটনায়। পাটনায় থেকে চাকরি করে। কারো জামাই থাকে গৌহাটিতে। সেখানে বউ-ছেলে-মেয়েদের পাঠিয়ে দিয়ে বাড়ির কর্তা একলা বাড়ি পাহারা দেয় আর ভাতে-ভাত ফুটিয়ে খেয়ে চাকরি বজায় রাখে। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখে শুধু পোস্টাফিস। সমস্ত

দেশটা যেন আতঙ্কে থর-থর করে কাঁপে।

এ-সব কথা সন্তোষবাবু মন দিয়ে শোনেন বটে, কিন্তু কিছু মন্তব্য করেন না। শিববাবু জিজ্ঞেস করেন—কী হে সন্তোষ, তুমি কিছু ঠিক করেছ নাকি? তুমি বলছো না যে কিছু?

সন্তোষবাবু আর কী বলবেন। তাঁর তো তিন কুলে কেউ নেই। লোকের শ্বশুরবাড়ি থাকে। কিন্তু তাও তাঁর নেই। মামার বাড়ি থাকে। তাও তাঁর নেই। এমন কি লোকের পৈত্রিক দেশ-গাঁ থাকে, তাও তাঁর ছিল না। তেমন লোক কী করে কলকাতার বাইরে কোথায় ফ্যামিলি পাঠায়?

আর মজা এই ঠিক সেই দুর্যোগের সময়েই ওই মেয়েটা জন্মালো। জন্মলগ্নেই যার দেশের অতো দুঃসময় সে বড়ো হয়ে আরো কতো দুঃসময়ের মোকাবেলা করবে সেই ভয়েই সন্তোষবাবু কাতর হয়ে উঠেছিলেন।

সে-সব দিনের সমস্ত কথা মনে আছে সন্তোষবাবুর।

এক সের চালের জন্যে কতোদিন কতো দোকানে গিয়ে ধর্ণা দিয়েছেন সন্তোষবাবু। এমন হয়েছে অনেকদিন যখন চালের অভাবে শুধু আলু সেদ্ধ করে খেয়েছেন দু'জনে। সেই খেয়েই অফিসে গিয়েছেন।

আবার এও হয়েছে যে রান্না করবার কয়লাও পাননি, স্টোভ্ জ্বেলে রান্না করবার জন্যে এক ফোঁটা কেরাসিন তেলও পাননি পয়সা দিয়ে কিনতে।

সেদিন সোজা দু'বেলা পাঞ্জাবীদের দোকান থেকে তন্দুরি রুটি আর ডাল কিনে এনে খেয়ে দু'জনে পেট ভরিয়েছেন।

কিন্তু বাচ্চা মেয়ে জয়ন্তীর মুখে তো একটু দুধ দিতে হবে। দুধ কোথায় পাবেন তিনি? পয়সা থাকলেও যে খাবার পাওয়া যায় না, এ-অভিজ্ঞতা তো সেই-ই প্রথমবার হলো কলকাতার মানুষদের।

এর জন্যে দায়ী কে?

অফিসে সবাই-এরই এই অভিজ্ঞতা আছে। যারা সে-সময়ে

সরকারী, বিশেষ করে রেলওয়ে বা পোস্টাফিসে চাকরি করতো তাদের জন্যে অফিসে-অফিসে সস্তা দরে আলু-চাল-তেল-মশলার দোকান খোলা হয়েছিল। তারা অফিসে গিয়ে কাজের চেয়ে রেশন কেনা-কাটার জন্যে বেশি সময় খরচ করতো।

সাহেব যদি জিজ্ঞেস করতো—এতক্ষণ কোথায় গিয়েছিলে?

বাবুরা বলতো—চাল-ডাল-নুন-তেল কিনতে গিয়েছিলুম স্যার।

তখনও সুজয়রা কলকাতায় আসেনি। এলো যখন তখন ও-সব ঝামেলা মিটে গেছে।

কিন্তু জয়ন্তীর ওই জন্ম-লগ্নেই দেশে এতো বিপর্যয় ঘটে গেল দেখে সন্তোষবাবুর খুব দুর্ভাবনাই হলো মেয়ের জন্যে।

অফিসের লোকদের কানে খবরটা যেতেই তারাও সবাই বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলো।

শিববাবু বললেন—এদিকে মানুষরা যখন কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে আর ঠিক সেই সময়েই তুমি কিনা জন-সংখ্যা বাড়ালে ভাই সন্তোষ?

অপ্রিয় হলেও শিববাবু অসত্য কথা বলেন নি। কিন্তু শুধু সন্তোষবাবুকে দোষ দেওয়া বৃথা। ইংলণ্ডে বা জার্মানীতে বা জাপানে কি যুদ্ধের সময়ে শুধু লোক মরছেই? সেখানে কি মানুষের মৃত্যুর পাশাপাশি মানুষের সংখ্যা বাড়েনি? কারো জন্ম হয়নি?

সন্তোষবাবু স্ত্রীকে বোঝাতে লাগলেন—দেখো, তুমি মন খারাপ কোর না। যদি ভাগ্যে থাকে তো দেখবে ওই মেয়েই একদিন হয়তো আবার আমাদের ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে। কে বলতে পারে? মানুষের ভাগ্যের ব্যাপারে কেউই তো কিছু বলতে পারে না আগে থেকে। তাই তো কথায় আছে 'জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।'

এটা অবশ্য স্তোকবাক্য। এ-কথা সন্তোষ মুখার্জিও যে জানেন না, তা নয়।

কিন্তু ওই জয়ন্তীর জন্মের পর থেকে স্ত্রী যেমন মুষড়ে পড়েছিলেন তাতে ওই রকম স্তোকবাক্য ব্যবহার করা ছাড়া আর কীই বা উপায় ছিল?

তারপর সন্তোষবাবু ওই মেয়ের নাম রেখেছিলেন—জয়ন্তী।

স্ত্রী জিজ্ঞেস করেছিলেন—ও নাম রাখলে কেন?

সন্তোষবাবু বলেছিলেন—'জয়ন্তী' নাম রাখলুম এই জন্যে যে ওই মেয়েই একদিন আমার তোমার আর নিজের দুর্ভাগ্যকে জয় করবে!

এ-কথায় স্ত্রী বাইরে কোনও মন্তব্য করেননি বটে, কিন্তু মন থেকে তিনি তাতে সায়ও দেননি। 'জয়ন্তী' নাম দিলেই যে মেয়ে পরিবারের সকলের ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে এমন অসম্ভব কথাতে তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে ভরসা পাননি।

এরপর পাড়ার অন্য বাড়ির মেয়েরা যেমন ভাবে মানুষ হয় জয়ন্তীও ঠিক তেমনিভাবেই মানুষ হতে লাগলো। অর্থাৎ পাড়ার ইস্কুলে পড়তে লাগলো। ইস্কুল থেকে বাড়িতে আসার পর সন্ধ্যেবেলা বাবার কাছেই পড়া-শোনা করতে লাগলো। পড়াশোনা করবার সময় অন্যরা যেমন ভুল করে জয়ন্তীও তেমনি ভুল করতে লাগলো। আর তাকে পড়াতে পড়াতে সন্তোষবাবুও মাঝে-মাঝে খুব রেগে যেতেন মেয়ের ওপর।

রাগারাগির শব্দ শুনে স্ত্রীও মাঝে-মাঝে এসে ঘরে ঢুকতেন।

বলতেন—অতো বকা-ঝকা করছো কেন গো ওকে? ছোট বয়েস, এখন ও তো ভুল করবেই। তা বলে অত মাথা গরম করলে চলে?

এ-সব ছোট বেলার ঘটনা। বাপ-মায়ের সমস্ত আশা-ভরসা তখন ওই মেয়েকে ঘিরেই গড়ে উঠতে লাগলো। ওই মেয়ে একদিন বড় হলে তখন আবার ওর বিয়েও দিতে হবে। তখন আবার জামাই আসবে বাড়িতে। জামাই যদি ভালো হয় তো সে-ই তখন ছেলের কর্তব্য করবে।

কিন্তু সেও তো ভাগ্যের ব্যাপার। সকলের সব ভাগ্য তো ভালো হয় না। অনেকের অর্থ ভাগ্য হয়তো ভালো হলো, কিন্তু পুত্র-ভাগ্য হয়তো আবার ভালো হলো না। আবার এমনও দেখা গেছে ভালো পাত্র দেখে বিয়ে দেওয়া হলো, বিয়ের পর দেখা গেল জামাই-এর বাড়ি-ঘর সব বন্ধক পড়েছে বাপের অসুখ হওয়াতে। বাপের এমন এক ক্যান্সার রোগ হলো যে তার চিকিৎসার খরচ যোগাতে যোগাতে বাড়ি-

গাড়ি-মা'র সোনার গয়না, বউ-এর সোনার গয়না, সব কিছু বিক্রি করতে হলো। অথচ সে-বাবাকে বাঁচানোও গেল না শেষ পর্যন্ত।

আবার এমনও দেখা গেছে যে বাবা-মা খুব গরীব। ছেলেও আহা-মরি কিছু নয়। সামান্য চাকরি করে পেট চালায়। মেয়ের বাপেরও টাকা-কড়ি তেমন নেই। অতি কষ্টে ধার-দেনা করে ওই পাত্রেরই সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন। মনে শুধু একটু আফশোষ রয়ে গেল যে ভালো পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া গেল না। তার জন্যে মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখেন।

হঠাৎ সেই সময়ে পৃথিবীতে যুদ্ধ বেধে গেল।

আর কী যে হলো, জামাই হুট করে চাকরি ছেড়ে দিলে।

বাবা-মা-শ্বশুর-শাশুড়ি সবাই ভয় পেয়ে গেল ছেলের কাণ্ড দেখে।

বাবা ছেলেকে বললে—এ কী করলি রে? হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেললি?

মা-ও ভয়ে অস্থির। নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালীরা চাকরি-অন্ত প্রাণ। সেই ছেলের এমন দুর্মতি হলো কেন? এই বাজারে চাকরি কেউ পায় না, আর তুই সেই চাকরিই কিনা ছেড়ে দিলি—

মেয়েও ভয় পেয়ে বাবাকে জামাই-এর কীর্তির কথা জানালে।

বাবা বললে—সে কী রে, জামাই চাকরিটা ছেড়ে দিলে? এখন তোদের চলবে কী করে?

মেয়ে বললে—কী জানি! আমি তো অনেক বলেছি, কিন্তু কারো কথা শুনলে না তোমার জামাই। কেবল বলে—ও-চাকরি করার চেয়ে না-খেতে পেয়ে মরাও ভালো।

বাবা মেয়ের কথা শুনে আরো অবাক হয়ে গেল। অথচ ওই চাকরির ভরসাতেই তো ওই ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল।

মেয়ের কান্নাকাটি দেখে বাবাও আর চুপ করে বাড়িতে বসে থাকতে পারলে না। গেল বেয়াই বাড়িতে। বেয়াই'মশাইকে গিয়ে বাবা জিজ্ঞেস করলে—অশোক নাকি চাকরিটা ছেড়ে দিলে?

বেয়াইমশাইকেও বেশ চিন্তিত দেখা গেল তখন।

বললে—হ্যাঁ, বেয়াইমশাই, কী যে দুর্মতি হলো অশোকের। বললে—ও-চাকরি করলে নাকি ওকে চিরকাল এমনি দুঃখ কষ্টের মধ্যেই কাটাতে হবে। তার চেয়ে নাকি একটা চান্স নেওয়া ভালো—

বাবা জিজ্ঞেস করলে—এখন অশোক কী করছে ?

বেয়াইমশাই বললেন—এখন মিলিটারি কনট্রাকটারি করছে। সেই কাজে সে ভোর পাঁচটার সময়ে বেরিয়ে যায় আর ফিরে আসতে আসতে রাত এগারোটা-বারোটা বেজে যায়।

তারপর সেই অশোক শেষকালে এত টাকা কামাই করতে লাগলো যে সারা কলকাতার লোক ধন্য-ধন্য করতে লাগলো তাকে। সেই ক'বছরের মধ্যেই চারটে গাড়ি, পঞ্চাশটা বাড়ি করে ফেললে। শ্বশুরকেও একখানা বাড়ি দিয়ে দিলে থাকবার জন্যে। আর সেই মেয়ে ? সেই মেয়েই আবার গাড়ি ছাড়া রাস্তায় চলেই না। মেয়ের গায়ে মুক্তো হীরে সোনার গয়না ঝল্-মল্ করতে লাগলো।

আর শুধু টাকা উপার্জন করবার কায়দা জানলেই তো হবে না। টাকাকে বেঁধে রাখবার কৌশলও জানা চাই। একদিক থেকে টাকা এলো আর ইনকাম-ট্যাক্স উকিল সব টাকা কেড়ে নিয়ে চলে গেল—এ-রকম ঘটনাও তো অনেক দেখা গেছে। টাকা উপায় করবার হিসেব আলাদা আর টাকা রেখে দেবার হিসেব আলাদা। সেই দু'টো হিসেবে যে পাকা সে-ই কেবল হলো ক্ষণজন্মা পুরুষ। সেই রকম বিদ্যে যার জানা তার নামই হলো জি-ডি-বিড়লা, জে-আর-ডি টাটা, আর-এন-মুখার্জি প্রভৃতি। তাঁরাই তাদের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন যে লক্ষ্মী চঞ্চলা নয়, লক্ষ্মীকে ঘরে বেঁধে রাখতে জানলে লক্ষ্মী থাকে।

এ-সব গল্প সন্তোষবাবুর অফিসে নিজেদের মধ্যে প্রতিদিনই হয়। এই টাকার গল্প সবাই যত মন দিয়ে শোনে তত মন দিয়ে অন্য কোনও গল্প শোনে না। রাজনীতি নিয়ে কথাও ওঠে। মন্ত্রীদের কেচ্ছা-কাহিনীও যে কেউ শোনে না তা নয়। আর খেলার কথা তো ওঠেই। পৃথিবীর কোন্ কোণে ক্রিকেটে কে কত রান করে আউট হয়ে গেল, কে কোন্ সালে ক'টা সেঞ্চুরি করেছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ খুঁটিনাটি

সকলের মুখস্থ। কিন্তু টাকা? টাকার গল্প সকলের যত মুখরোচক লাগে তত মুখরোচক আর কোনও বিষয়ের গল্প লাগে না।

টাকার গল্প উঠলে অন্য সব প্রসঙ্গ ধামাচাপা পড়ে যায়।

সেদিন শিববাবু একটা গল্প বললেন। গল্পটা তাঁদের পাড়ার। সেই গল্পটা শুনে এসে সন্তোষবাবু বাড়িতে তাঁর স্ত্রীকে বললেন।

বললেন—জানো, আজকে অফিসে শিববাবু একটা গল্প বললেন। শুনলে তুমিও অবাক হয়ে যাবে।

—কী গল্প?

বলে তাঁর স্ত্রীও উনুন থেকে তরকারীর কড়াটা নামিয়ে রেখে এসে গল্পটা শুনতে বসলো।

শিববাবু হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলে থাকেন। তাঁরই বাড়ির পাশেই কোন্ এক শ্যামলবাবুর বাড়ি। শ্যামলবাবুর তিন মেয়ে ছিল। দু'টো মেয়ের বিয়ে দিতে পেরেছিলেন কোনও রকমে। নিজের যাবতীয় সম্পত্তি-টাকা-কড়ি সমস্ত খরচ হয়ে গিয়েছিল ওই দু'টো মেয়ের বিয়ে দিতে।

তারপর বাকি রইল ছোট্ট মেয়েটা। তারও তো বিয়ে দিতে হবে। কিন্তু অত টাকা শ্যামলবাবু কোথায় পাবেন?

ছোট মেয়েটার তাই আর বিয়েই হয় না। এদিকে দিন-দিন তার বয়েস বেড়েই চলেছে।

তারপর?

—তারপর শ্যামলবাবু আর তাঁব স্ত্রী কী করবেন সেই ভাবনাতেই অস্থির। কোনও দিকে আর কোনও সুরাহার আভাস দেখতে পান না তাঁরা।

শ্যামলবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন—এখন কী করি বলো তো?

স্ত্রী বলেন—আমি কী বলবো?

শ্যামলবাবুর নিজের মাথাতেও কোনও বুদ্ধি গজায় না। একদিকে টাকাও ফুরিয়ে গেছে, আর অন্যদিকে মেয়ের বয়েস কেবল লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে।

ঠিক সেই সময়ে একদিন ছোট মেয়েটা কোথায় পালিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

শ্যামলবাবুর তখন বেশ বয়েস হয়েছে। ব্লাড্-প্রেশারের যন্ত্রণা আছে। তাঁর স্ত্রীরও খুব বয়েস হয়েছে তখন। শ্যামলবাবু খবর পাঠালেন জামাইদের কাছে। মেয়ে জামাইরা সবাই কলকাতার বাইরে থাকে। তাদের নিজেদেরও সংসার আছে, তাদের সংসারেও অনেক ঝামেলা আছে। হুট্ করে বললেই তো আর হুট্ করে আসতে পারে না তারা। চাকরিতে ছুটি নিতে হয়।

সুতরাং শ্যামলবাবুর মাথায় বাজ ভেঙে পড়লো।

মেয়ে-জামাইরা যখন এলো তখন বেশ দেরি হয়ে গিয়েছে। তারাই এসে পুলিশে খবর দিলে।

পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করলে—কবে পালিয়ে গেছে?

জামাইরা তারিখটা বলতেই পুলিশের রাগ হয়ে গেল।

বললে—এক মাস হয়ে গেল, এত দেরিতে আপনাদের ঘুম ভাঙলো? এতদিন কী করছিলেন? সে মেয়ে কি আর এখানে আছে? সে হয়তো বর্ডার পেরিয়ে নেপালে চলে গেছে। সেখানে চলে গেলে কি আর তার পাত্তা পাবো?

জামাইরা বললে—মেয়ের বাপ বুড়ো মানুষ, ব্লাড-প্রেশারের রুগী। তিনি ছাড়া আর তো কোনও পুরুষ মানুষ নেই তাদের বাড়িতে। তাঁরা থানায় এসে খবর দিতে পারেননি।—

পুলিশ-অফিসার বুঝতে পারলে ব্যাপারটা। বললে—ঠিক আছে, আমি ডায়েরি করে নিলুম, খবর পেলে জানিয়ে আসবো—

এইভাবে শুরু। তারপর কত দিন কেটে গেল। মেয়ে-জামাইরা আর কতদিনই বা অপেক্ষা করবে। ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ার পর তারা ফিরে গেল যে-যার ঠিকানায়। যাবার সময় বলে গেল যে আবার ছুটি পেলে তারা আসবে।

শ্যামলবাবুও জানালে যে যদি কোনওদিন মেয়ের খবর পুলিশ দেয় তো চিঠি লিখে তাদের দু'জনকেই জানাবে।

স্ত্রী শুনছিল গল্পটা। জিজ্ঞেস করলে—তারপর কী হলো ? মেয়েকে পাওয়া গেল ?

সন্তোষবাবু বললে—সেইটেই আশ্চর্য কাণ্ড! শ্যামলবাবুর শরীরের অবস্থা তখন খুব খারাপ। শ্যামলবাবুর স্ত্রীর শরীরও খুব ভালো নয়। তার ওপর আর্থিক অবস্থাও তাদের ভালো নয়। টাকা থাকলে মানসিক অবস্থাটার তবু কিছুটা সুরাহা হয়। ভেবে দেখ কী-রকম অসহায় ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী। ছোট মেয়েটা না থাকলে শ্যামলবাবুর কোনও দুঃখই থাকতো না। শেষ জীবনে ওই রকম শোক তাঁকে একেবারে পাথরে পরিণত করে দিলে।

তারপর হঠাৎ একটা মজার ঘটনা ঘটলো।

একদিন সকালে বলা-নেই-কওয়া-নেই হঠাৎ একটা বিরাট গাড়ি এসে দাঁড়ালো শ্যামলবাবুর বাড়ির সামনে। একেবারে নতুন একটা বিলিতি গাড়ি।

শ্যামলবাবু একটু অবাকই হয়েছিল ওই নতুন বিলিতি গাড়িটা তার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে। তার বাড়িতে আবার এমন গাড়ি করে কে আসতে যাবে ?

আর, আশ্চর্য, সেই গাড়ি থেকেই নামলো কিনা তার মেয়ে।

প্রথমে শ্যামলবাবুর একটু সন্দেহ হয়েছিল। সত্যিই গাড়িটা থেকে যে-মেয়েটা নামলো সে তার মেয়ে, না অন্য কেউ ? নিজের মেয়েকেও কি চিনতে তার কষ্ট হবে ?

তারপর যখন মেয়েটা এসে শ্যামলবাবুর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বলে উঠলো—বাবা, তুমি আমাকে চিনতে পারছো না ?

তখন শ্যামলবাবুর মাথাটা ঘুরে গেল।

বললে—আরে মিনি, তুই ? এতদিন কোথায় ছিলি ?

ভেতর দিকে স্ত্রীর উদ্দেশে ডাকলে—ওগো, দেখ কে এসেছে। মিনি, আমাদের মিনি এসেছে গো, দেখবে এসো—

ডাক পেয়ে শ্যামলবাবুর স্ত্রীও বাইরে এসেছে।

তার আগেই গাড়ি থেকে নেমেছে আর একজন স্যুট পরা ছেলে।

সে ছেলেটি এসে শ্যামলবাবুকে আর শ্যামলবাবুর স্ত্রীকে প্রণাম করেছে—

শ্যামলবাবু তাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলে—তুমি কে বাবা? তোমাকে তো চিনতে পারলুম না—

মিনিই তার হয়ে বললে—এ তোমার জামাই বাবা।

জামাই!!! শ্যামলবাবু আর স্ত্রী দু'জনেই কথাটা শুনে চমকে উঠলো। জামাই? তার মানে তাদের মিনির সঙ্গে এর বিয়ে হয়েছে?

ছেলেটি বললে—আমি তো আপনাদের পাড়াতেই আগে থাকতুম। ওই সামনের কারখানাতেই ফিটারের কাজ করতুম। এখন মিলিটারি কন্‌ট্রাকটর হয়েছি। এখন বেলুড়ে নিজেই একটা ফ্যাক্টরি করেছি। ফ্যাক্টরির নাম দিয়েছি 'দি মৃন্ময়ী আয়রণ ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি—'

গল্পটা শেষ করে সন্তোষবাবু বললেন—দেখো, কা'র ভাগ্যে ভগবান কী লিখেছে কেউই বলতে পারে না—। নইলে বড়ো দু'টো মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল কত ঘটা করে। শ্যামলবাবু ভেবেছিল দুটি মেয়ে ভালো ঘরে পড়েছে, আর ছোটটার ওপর একেবারে ভরসাই রাখেনি। ভেবেছিল তার টাকা নেই বলে ছোট মেয়েটার কোনও ভবিষ্যৎই নেই। কিন্তু এখন?

তা এখন সেই শ্যামলবাবুর শেষ জীবনে খুব সুখ। শ্যামলবাবু আর তার স্ত্রী দু'জনেই এখন নিজেদের ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে জামাই-এর বেলুড়ের বিরাট প্রাসাদের মতোন বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। দরোয়ান, চাকর, ঝি, ড্রাইভার-জামাই-এর ঐশ্বর্যের আর শেষ নেই। আর বড়ো দুই জামাই, তারাও তাদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন ভায়রাভাই-এর 'দি মৃন্ময়ী আয়রণ ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড্ কোম্পানি'তে মোটা মাইনের চাকরি করছে! বলো তো—এমন ঘটনার কথা এর আগে কখনও শুনেছ?

সন্তোষবাবু গল্প শেষ করে বললেন—যে-জামাই-এর ওপর বাপ মোটে ভরসা করেনি, যে-জামাই বিয়ের আগে ছিল কারখানার একজন

সামান্য মিস্ত্রী, সেই জামাই-ই কিনা শ্বশুর-শাশুড়ী ভায়রাভাই গুষ্টিশুদ্ধ লোকের ভাগ্য ফিরিয়ে দিলে! অন্য লোকের কাছে বললে তারা গাঁজাখুরি গল্প বলে হেসে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু এ তো তা নয়। এ আমাদের অফিসের শিববাবুর নিজের চোখে দেখা ঘটনা!

সন্তোষবাবুর স্ত্রী বলতো—আমিও তো তাই বলি। তুমি জয়ন্তীর জন্যে অতো ভাবো কেন? জয়ন্তীর একটা-না-একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই—

আর শুধু যে সন্তোষবাবু আব তাঁর স্ত্রীই জয়ন্তীব জন্যে ভেবে ভেবে মরতেন তা নয। জয়ন্তীর কানেও গল্পগুলো ঢুকতো।

তাকে নিয়ে যে তার বাবা-মা'র খুব দুর্ভাবনা তা সে জন্মের পর থেকেই শুনে এসেছে। সে শুনে এসেছে যে সে-ই হচ্ছে বাবা-মা'র একমাত্র মাথা-ব্যথা। শুনে এসেছে যে সে ছেলে হয়ে জন্মালে বাবা-মা'য়ের এত দুর্ভাবনা কবতে হতো না। মেয়ে হয়ে তার জন্ম হয়েছে বলেই তার জন্যে তাদের এত যন্ত্রণা।

একটু বড় হতেই যখন এই সব আলোচনা তার কানে যেত তখন সে রেগে-মেগে বলে উঠতো—মা, আমার বিয়ে দিও না তোমরা।

মা বলতো—কেন রে, হঠাৎ তুই ও-কথা বলছিস কেন?

জয়ন্তী বলতো—আমাকে নিয়ে যে তোমাদের এত মাথা-ব্যথা!

মা বলতো—তা মেয়ে হলে তো বাপ-মা'য়ের মাথা-ব্যথা হয়ই—।

জয়ন্তী বলতো—আমি ছেলে হলে তোমাদের বুঝি ভাবনা হতোনা?

মা বলতো—না। ছেলে হলে ভাবনা হবে কেন? ছেলে হলে সে তো বিয়ের পর বাপ-মা'কে ছেড়ে পরের বাড়িতে চলে যায় না। নিজের বাড়িতেই থাকে। আর মেয়ে হলে যে বিয়ের পরে সে পরের বাড়ি চলে যায়!

জয়ন্তী বলতো—তাহলে আমাকেও তোমরা বিয়ে দিও না।

—কেন? ও-কথা বলছিস কেন?

জয়ন্তী বলতো—বিয়ে দিলেই তো আমি তোমাদের কাছে পর হয়ে যাবো।

মা বলতো—তুই বুঝি সব সময়ে ওই সব কথাই ভাবিস ?

জয়ন্তী বলতো—ভাববো না ? তোমরা আমাকে নিয়ে এত ভাবো কেন, সেই জন্যেই তো আমিও আমাকে নিয়ে এত ভাবি। আমি যদি তোমাদের ছেলে হয়ে জন্মাতাম তাহলে তো তোমরাও আমাকে নিয়ে এত ভাবতে না, আর আমিও আমাকে নিয়ে এত ভাবতুম না—

মা বলতো—এসব কথা না ভেবে তুই তোর লেখা-পড়ার কথা নিয়ে ভাব না। ভালো করে পাশ করলে তো তোরই ভালো। ভালো বর পাবি—

শেষের দিকে এই সব আলোচনা জয়ন্তীর কাছে একেবারে অসহ্য লাগতো। সে মনে মনে ভাবতো এর থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কী করে? কী করে বিয়ের হাত থেকে সে মুক্তি পাবে ?

স্কুলের বন্ধুরা যখন গল্প করতো তখনও সেই ছেলেদের নিয়েই কেবল আলোচনা। কোন্ ছেলে কাকে লক্ষ্য করে কোন্ পত্রিকায় কী কবিতা লিখেছে, সেই কবিকে নিয়ে যখন আলোচনা হতো তখন জয়ন্তী রেগে যেতো।

বলতো—তোদের মুখে কি 'ছেলে' ছাড়া আর কোনও কথা নেই ? সব সময়ে কেবল ছেলে ছেলে আর ছেলে ? কেন, মেয়েরা কি মানুষ নয় ?

বন্ধুরা জয়ন্তীর এই মনোভাবের কথা জানতো।

বলতো—শেষ পর্যন্ত তো ওই ছেলেরাই আমাদের গতি রে—

জয়ন্তী বলতো—সব তোদের বাজে কথা। বিয়ে না করেও ভালো করে বেঁচে থাকা যায়। তোরা হিস্ট্রিতে পড়িসনি সিস্টার নিবেদিতার কথা, ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের কথা।

মঞ্জুলা বলতো—দেখবো তুই কতদিন বিয়ে না করে থাকতে পারিস।

জয়ন্তী বলতো—আমি যদি একটা ভালো চাকরি পেয়ে যাই তো বিয়ে করতে আমার বয়ে গেছে !

—তুই চাকরি করবি ? চাকরি করার কী জ্বালা তা জানিস ?

জয়ন্তী বলতো—পুরুষরা যদি চাকরি করতে পারে তো মেয়েরা

চাকরি করতে পারবে না কেন ?

মঞ্জুলা বলতো—আমাদের পাড়ায় একটা মেয়ে রেলের চাকরি পেয়েছে, তার যে কী কষ্ট তা তার মুখ থেকেই শুনেছি—

—কীসের কষ্ট ?

মঞ্জুলা বলতো—আরে, ওখানে সবে মেয়েরা ঢুকতে শুরু করেছে, এই প্রথম অফিসে একজন মেয়ে চাকরি করতে ঢুকেছে। চারদিক থেকে কেবল চিঠি আসে তার নামে—

—চিঠি ? কার চিঠি ?

মঞ্জুলা বলতো—উড়ো চিঠি রে। উড়ো চিঠি সব !

জয়ন্তী জিজ্ঞেস করতো—কারা সেসব চিঠি লেখে ?

মঞ্জুলা বল.তা—উড়ো চিঠিতে কখনও কেউ নাম ধাম দেয় ? অশ্লীল চিঠি সব !

জয়ন্তী বলতো—ওপরওয়ালার কাছে সে তাহলে কমপ্লেন করলে না কেন ?

—কমপ্লেন করে কী হবে ? কোনও ওপরওয়ালা তার ওপর কোনও অ্যাকশন নেবে না। উল্টে তার নিজেরই বদনাম হবে। ওপরওয়ালা বলবে—'এমন ভাবে শাড়ী-ব্লাউজ পরুন যাতে এমন চিঠি আর না আসে।' সে আরো লজ্জার।

জয়ন্তী বলতো—প্রথম প্রথম বলে ওইরকম উড়ো চিঠি আসছে। কিন্তু যখন মেয়েরা দলে-দলে অফিসে চাকরি করতে ঢুকবে তখন দেখবি ওদের ওই সব গুণ্ডামি বন্ধ হয়ে গেছে।

এই জয়ন্তীর মতো মেয়েকে নিয়ে সন্তোষবাবু যে কী উপায় করবেন তা তিনি বুঝতে পারতেন না।

মাঝে মাঝে স্ত্রীকে বলতেন—এখন কী রকম দেখছো তোমার মেয়েকে ? একটু বদলিয়েছে ?

স্ত্রী বলতো—ও নিয়ে তুমি আর অতো ভেবো না, বয়েস হলে ও-সব দূর হয়ে যাবে। এখন সামনে পরীক্ষা, তাই সেইসব নিয়েই ও খুব ব্যস্ত—

অফিসে সকলের সঙ্গে গল্প করতে করতে যখন অন্যদের মেয়ের

বিয়ের কথা শুনতেন তখন তাঁর নিজের মেয়ের কথাও মনে হতো।

সুশীলবাবু নিজের মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি দিয়ে গেছেন সকলকে। সুশীলবাবুর ওই একটি মাত্র মেয়ে। তার পরে ছেলে। ছেলে ছোট। স্কুলে পড়ছে। আর তাঁর মেয়েরও এমন কিছু বিয়ের বয়েস হয়নি যে সাত-তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দিতে হবে।

সুশীলবাবু আগেই বলেছিলেন যে মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়াই ভালো।

অন্য সবাই জিজ্ঞেস করতেন—কেন? ও-কথা বলছেন কেন?

সুশীলবাবু বলতেন—আজকাল মশাই আইবুড়ো মেয়ে বাড়িতে পুষে রাখা ডেনজারাস। পাড়ায় পাড়ায় মাস্তানি যা বাড়তে আরম্ভ করেছে, সে আর আপনাদের কী বলবো।

তারপর তিনি তাঁদের পাড়ার বখাটে ছেলেদের কাণ্ড-কারখানার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করতেন।

বলতেন—রাস্তা দিয়ে কোনও মেয়ের যাওয়া-আসাই ছিল মুশকিল মশাই। গেলেই টিপ্পনি ছুঁড়ে মারবে মাস্তানরা—

শিববাবু বলতেন—সে কি? আমাদের হাওড়াতেই তো ও-সব আছে। আপনি তো বালিগঞ্জে থাকেন, আপনাদের পাড়াতেও ওই সব আছে নাকি?

সুশীলবাবু বলতেন—আর কোন্ পাড়ায় ওই সব কাণ্ড নেই তাই বলুন? আমার শালী থাকে নিউ-আলিপুরে, সেখানেও ঐসব শুরু হয়েছে—

—সে কী? নিউ-আলিপুরেও তাই?

কেদারবাবু বলতেন—কেন হবে না বলুন? যুদ্ধের সময়ে পাড়ার সব বেকার ছেলেরা সিভিক-গার্ড আর এ-আর-পি'র চাকরি পেয়ে গিয়েছিল। তাই তখন ও সব ক'বছরের জন্যে বন্ধ ছিল। কিন্তু তারপর থেকে তো সব বেকার। কী করবে তারা? পাড়ার রোয়াকে বসে তাই রাতদিন কেবল আড্ডা মারে আর সিগ্রেট খায়—

শিববাবু বলতেন—শুধু কি সিগ্রেট খায় ভাবছেন? আর কী খায় জানেন?

—কী ? কী খায় ?

শিববাবু বলতেন—আরে মশাই, আজকাল সব নানা-রকম পিল্ বেরিয়েছে বাজারে, তারা সেই সব পিল্ খায়।

—কী পিল্ ? পিলের নাম কী ?

শিববাবু বলতেন—সব পিলের কি নাম আমি জানি মশাই ? অনেকের মুখে শুনেছি একটা পিলের নাম ম্যান্‌ড্রেক্স। সেটা খেলে নাকি একেবারে স্বর্গসুখ। মুখে দিলেই মনে হবে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মতো সুখ বুঝি আর কিছুতে নেই। তখন যে আপনার চাকরি নেই, তখন যে আপনি খেতে পাচ্ছেন না, তখন যে আপনার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, সে-সব কথা আপনি স্রেফ ভুলে যাবেন !

সবাই খবরটা শুনে অবাক। এমন পিলও তাহলে বাজারে আছে ? তাহলে তো সেই পিল্ আমরা সবাই-ই খেতে পারি। আমরাও সেই পিল্ খেয়ে আমাদের সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে যেতে পারি !

—আর শুধু কি তাই ? এক রকম সিগারেট বেরিয়েছে, সেই সিগারেট খেলেই খানিক পরেই একটু রক্ত বমি হবে। বমি হওয়ার পর সে যে কী আরাম। তখন মনে হবে আপনি লটারিতে জিতে দশ লাখ টাকার মালিক হয়ে গেছেন।

কাননবাবু জিজ্ঞেস করলেন—সে সিগারেটের দাম কত ? কোথায় পাওয়া যায় সে-সিগারেট ?

শিববাবু বলতেন—সে-সব সিগারেট সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। তবে কোনও পান সিগারেটের দোকানে সে-সিগারেট কিনতে পাবেন না—

—কেন ?

—আরে মশাই, সে তো আসলে সিগারেটই নয়। সেই মশলাটা কিনে আপনি নিজে সিগারেটের কাগজে পুরে নিজের হাতে পাকিয়ে নেবেন। তাহলেই সিগারেট হয়ে গেল।

সন্তোষবাবু জিজ্ঞেস করলেন—সেই মশলাটা কীসের মশলা ? কী দিয়ে তৈরি ?

শিববাবু বললেন—সে এক নতুন ধরনের মশলা। তার নামটা জানি না—

—সে আবার কী জিনিস ?

শিববাবু বললেন—সে এক রকমের ড্রাগ। থাইল্যাণ্ড থেকে নেপাল আর পাকিস্তান হয়ে ইণ্ডিয়ায় আসে। তারপর অন্য চোরাপথে ইয়োরোপ আমেরিকায় আবার আর সব দেশে দেশে চলে যায়। এখানে যেটার দাম ষাট টাকা ভরি, আমেরিকায় গিয়ে সেই এক ভরির দামই হয়ে যায় ছ'শো টাকা—আমেরিকায় ওটার খুব ডিম্যাণ্ড—

সন্তোষবাবু অফিস থেকে এই সব গল্প শুনে বাড়িতে এসে আবার স্ত্রীকে সব গল্প করতেন।

বললেন—বলো তো, কী সব কাণ্ড চলছে দেশে। এ-সব কথা তো বাপের জন্মেও শুনিনি! সুশীলবাবু সেই ভয়েই নিজের মেয়ের বিয়েটা দিয়ে দিলেন আগেভাগে। এই দেখ না, সুশীলবাবুর মেয়ের বিয়ের চিঠি। দেখ কেমন ভালো একটা পাত্র জুটিয়ে ফেলেছেন। বাপের এক ছেলে। ইঞ্জিনীয়ার। দু' হাজার টাকা এখন মাইনে পায়। নিজের পৈত্রিক বাড়ি আছে। এর চেয়ে ভালো পাত্র আর কে কোথায় পাবে ? সবই কপাল, বুঝলে গো ? সবই কপাল—

এ-সব কথা যখন হয় তখন জয়ন্তী কাছাকাছি থাকে না। তার সামনে এ-সব কথা তুলতে চান না সন্তোষবাবু।

আর শুধু সুশীলবাবুর মেয়ের বিয়ের কথাই নয়, আরো যে-সব গল্প অফিসে হয়, সে-সব গল্পও করেন তিনি স্ত্রীর কাছে। ওই সব নেশায় সিগারেট। কোনও কথাই বাদ যায় না।

—আর জানো, ও-সব নেশা নাকি রাস্তাঘাটে সব জায়গায় বিক্রী হয়। ধর্মতলায় যেখানে বাস স্ট্যাণ্ড আছে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেই নাকি দালালরা এসে ওই সব নেশার জিনিস বেচে। আর ছেলে-ছোকরারা নাকি ওই সব কিনে খায়। আবার শুনলুম স্কুল-কলেজের মেয়েরাও নাকি ওই সব নেশা ধরেছে। বিশেষ করে যারা ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে পড়ে তারাই নাকি বেশি নেশা করে। কী

আশ্চর্য, আমি তো কল্পনাও করতে পারি না ও-সব। দিন-কাল সব কী হলো বলো তো? কোথা থেকে এ-সব নেশার জিনিস দেশে আমদানি হলো? কে আমদানি করলে? এর পেছনে কারা?

অফিসের শিববাবু বলেন—এসব ব্যাপারের পেছনে আছে সি-আই-এ, এই আমি বলে রাখলুম—তার মানে আমেরিকা—

অফিসের বাবুরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। যদি হঠাৎ খুব জোরে বৃষ্টি পড়ে শহর ভাসিয়ে দেয়, তার পেছনেও সি-আই-এ। যদি বাসে-ট্রামে ধাক্কা লেগে কিছু লোক মারা যায়, তার পেছনেও সি-আই-এ। যদি সব মানুষ নেশা করে বা ম্যানড্রেক্স খেয়ে বুঁদ হয়ে ঝিমোয়, তাহলেও তার পেছনে আছে সি-আই-এ। মানে আমেরিকা। বাঙালীদের স্বভাবই এই রকম। নিজেরা দোষ করবে, কিন্তু দোষ চাপাবে পরের ঘাড়ে। এ বাঙালীদের জাতিগত এবং মজ্জাগত স্বভাব। এর ওপর আর কী মন্তব্য করবো বলুন?

সেদিন কিন্তু সবাই সুশীলবাবুর কপালকে ঈর্ষা করতে লাগলেন। সবাই জিজ্ঞেস করলেন—জামাইকে নগদ কত দিতে হলো সুশীলবাবু?

সুশীলবাবু বললেন—কিছু না। একটা পয়সাও নগদের দাবী ছিল না পাত্রপক্ষের। আমার মেয়েকে দেখেই তাঁরা ফাইন্যাল কথা দিয়ে গিয়েছিলেন। এখন আমার সাধ্যমতো আমি খরচ করছি। মেয়ে-জামাইকে আমি সাধ্যমত যা-পারি দিচ্ছি।

সন্তোষবাবু ভাবলেন—এও ভাগ্য! হয় সুশীলবাবুর ভাগ্য, নয় তো সুশীলবাবুর স্ত্রীর ভাগ্য। আর নয় তো সুশীলবাবুর মেয়ের ভাগ্য। অফিসসুদ্ধ লোক এ-ব্যাপার সম্পূর্ণ একমত যে পৃথিবীর যার যা-কিছু ঘটছে সমস্তই ভাগ্যের কল্যাণে। কার ভাগ্য কখন খোলে আর কার ভাগ্য কখন খারাপ হয় তা মানুষ কেন, দেবতারাও বলতে পারেন না।

অফিসে যা-যা গল্প হয়, যা-যা আলোচনা হয়, সমস্ত গল্পই বাড়িতে এসে স্ত্রীকে শোনান সন্তোষবাবু।

স্ত্রী জিজ্ঞেস করেন—তা তোমরা কি আপিসে শুধু গল্পই করো, কোনও কাজ করো না?

সন্তোষবাবু বলেন—আজকাল কাজ আর কে করে বলো। আমরা যারা আগের যুগে লোক তারাই তবু যা কিছু কাজ করি, আজকাল যারা নতুন ঢুকেছে তারা তো সেটুকুও করে না। তারা কেবল সিনেমা নিয়েই আলোচনা করে।

কিন্তু সব চেয়ে যে-বিষয়টা সন্তোষবাবুকে বেশি করে নাড়া দিত তা হচ্ছে আজকালকার-ছেলে মেয়েদের চাল-চলন। তাদের দেখে আর তাদের কথা শুনে তিনি হতাশ হয়ে যেতেন।

শিববাবু মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন কী হলো, সন্তোষবাবু, আপনার মেয়েরও তো বিয়ের বয়েস হলো! তারও তো বিয়ে দিতে হবে।

সন্তোষবাবু বলতেন—তা তো দিতেই হবে শিববাবু। মেয়ে যেদিন জন্মেছে সেই দিন থেকেই তো সেটা আমার মাথায় ঘুরছে। কিন্তু আজকাল তেমন পাত্রই বা কোথায় পাই বলুন? আপনি তো খবরের কাগজে সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন!

শিববাবু বলতেন—সব ছেলেই যে খারাপ তা বলবো না মশাই: তারই মধ্যে কত ভালো ভালো ছেলে আছে তার কি খবর রাখেন?

সন্তোষবাবু বলতেন—সব খবর রাখি শিববাবু। খবর রাখি বলেই তো এত ভয় পাই—

—কী রকম?

সন্তোষবাবু বলতেন—জানেন, সেদিন একটা ছেলের খবর পেলুম, বয়েস পঁচিশও হয়নি। পাত্রের নাম ধীরাজ গাঙ্গুলী। আমেরিকা থেকে কী সব ডিগ্রী নিয়ে এসে হায়দ্রাবাদে একটা প্রাইভেট সেকটারে চাকরি করছে। মাইনে পায় মাসে ন'হাজর টাকা। ভাবতে পারেন ন'হাজার টাকা মাসে! ভাবলুম, ছেলেটার সম্বন্ধে খবর নিই। তা পাত্র অতো দূরে রইলো, কলকাতায় বসে আমি কী করে খবর পাই?

শিববাবু জিজ্ঞেস করলেন—তারপর? তারপর কী হলো?

সন্তোষবাবু সে-কাহিনীটাই বললেন সবিস্তারে। পাত্রের বাবা একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন খবরের কাগজে। সেই বিজ্ঞাপন দেখেই সন্তোষবাবু চিঠি দিয়েছিলেন যে তাঁরও একটি অনূঢ়া বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে।

পাত্রের বাবা থাকেন কলকাতায়। তিনিই লিখলেন যে তিনি একদিন পাত্রী দেখতে আসবেন।

জয়ন্তীকে সে-কথা আগেই বলা হলো।

জয়ন্তী ক্ষেপে উঠলো সে-কথা শুনে। বলে—আমি বিয়ে করবো না।

মা মেয়ের ব্যবহারে একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। বললেন—কেন রে, কেন বিয়ে করবি না? শুনছিস পাত্র আমেরিকা-ফেরত। মাসে ন'হাজার টাকা মাইনে পায়—

জয়ন্তী বললে—ন'হাজার টাকা মাইনে পায় বলে কি আমার মাথা একেবারে কিনে নিয়েছে? আমি অতো বড়লোককে বিয়ে করবো না—

—কেন, অতো বড়লোককে বিয়ে করতে তোব আপত্তিটা কিসের বড়লোকের সঙ্গে বিয়ে হলে তোর কতো আরাম হবে বল্ তো?

এ-কথার কোন্ও উত্তর দেয়নি জয়ন্তী। তার এমন ভাব যেন তার কাছে মাসে ন'হাজার টাকা মাইনের দাম নেই।

সন্তোষবাবু অনেক বোঝালেন মেয়েকে।

বললেন—ওরে, টাকাকে অতো হেলা-ফেলা করিস না। জানিস, আজকাল লেখা-পড়া জানা কতো লক্ষ লক্ষ ছেলে বেকার হয়ে রস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন বর তুই কোথায় পাবি?

জয়ন্তীর এক কথা—না, যারা বড়লোক তারা কথায় কথায় সারা জীবন টাকার খোঁটা দেয়। এ আমি জানি।

—তুই কোথা থেকে জানলি যে বড়লোকরা টাকার খোঁটা দেয়?

জয়ন্তী বললে—আমার ক্লাসের মেয়েরা বলেছে।

—তোর ক্লাসের মেয়েরা কী বলেছে?

জয়ন্তী বললে—আমার একজন ক্লাসফ্রেণ্ডের দিদির সঙ্গে একজন বিরাট বড়লোকের ছেলের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ে করার এক বছরের

মধ্যে তার দিদি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল—

—কেন, আত্মহত্যা করেছিল কেন ?

জয়ন্তী বললে—আত্মহত্যা করেছিল এই জন্যে যে তারা সব সময় দিদির বাপ-মা'কে গরীব বলে খোঁটা দিত।

সন্তোষবাবু জয়ন্তীর কথা শুনে আকাশ-পাতাল কিছুই বুঝতে পারলেন না। এমন ঘটনার কথা সন্তোষবাবু জীবনে কখনও শোনেন-নি। সন্তোষবাবুর স্ত্রীও শোনেনি।

জয়ন্তীর মা বললে—দূর, যতো সব বাজে কথা। নিশ্চয়ই এর পেছনে অন্য কোনও কারণ আছে। তোকে ওই বলে সবাই ভুল বুঝিয়েছে। নিশ্চয়ই এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য আছে—তোকে আসল কারণটা বলেনি—

তাই বলছিলাম—শেষ পর্যন্ত সে এলো।

অথচ কতো বছর আগেই তো তার আসার কথা ছিল। আমার আত্মীয়স্বজন সবাই-ই তো আশা করেছিল একদিন সে আসবে। আমাদের সংসার আলো করে দেবে সে এসে !

কিন্তু আমার মনে হলো সেদিন সে না-এসে যেন ভালোই করে-ছিল। সেদিন এলে তো বুঝতেই পারতুম না যে আমাদের দেশে আমরা কতো অন্যায়, কতো অনাচার, কতো অত্যাচারের মধ্যে বাস করছি। কত ঘুষ, কত কালো টাকা, কত হিংসে আমাদের প্রতিমুহূর্তে গ্রাস করে চলেছে।

আমি তখনও বুঝতে পারছি না সুজয় আমাকে এ-সব অবান্তর কথা বলছে কেন ? এ-সব কথার সঙ্গে তার জীবনের কী সঙ্গতি আছে ? কী সম্পর্ক আছে সুজয়ের সঙ্গে সেই অতো দিনকার আগের জয়ন্তীর ? আজ এতদিন পরে এমন কী হলো যে আবার সেই জয়ন্তী মুখার্জির কথা আমাকে বলতে এলো ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কেন? এ-কথা বলছিস কেন এতদিন পরে? জয়ন্তীর সঙ্গে এতদিন পরে কি আবার দেখা হয়েছে তোর?

সুজয় বললে—হ্যাঁ।

—কোথায় দেখা হলো?

সুজয় বললে—এতদিন পরে আবার সে এলো—আর এলো আমার বাড়িতেই—

—কেন?

সুজয় বললে—তা বলতে গেলে আরো অনেক আগেকার কথাও যে বলতে হবে। তা না বললে তুই যে কিছু বুঝতেই পারবি না। আমার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ হওয়ার আগের কথাও অনেক বলতে হবে। সেই সব কথা আগে বলি, যা আমি জানতে পেরেছি—সে-সব বললেই তুই সব বুঝতে পারবি।

একদিন সন্তোষবাবু আর তাঁর স্ত্রী দু'জনেই জয়ন্তীকে জোর করে ধরে বসালো।

বললে—আমরা তোর বিয়ের জন্যে এত চেষ্টা করছি, তবু তোর বিয়ে করতে এত অনিচ্ছে কেন?

জয়ন্তী বললে—অনিচ্ছে কেন তা তোমরা জানো না?

সন্তোষবাবু বললেন—না, জানি না।

—যদি না জানো তো আমার কাছে জেনে নাও। আজকাল গরীব লোক বড়লোক সকলেই টাকার জন্যে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে, আর টাকা না পেলেই বউকে খুন করছে। করছে না?

সন্তোষবাবু আর তাঁর স্ত্রী মেয়ের কথা শুনে অবাক। তাঁর মুখ দিয়ে এর কোনও জবাব বেরোল না। তাঁদের মেয়ের মুখ দিয়ে কিনা এই প্রশ্ন উচ্চারিত হলো? দু'জনেই স্তম্ভিত হয়ে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

জয়ন্তী আবার বলে উঠলো—তোমরা জানো না আজকাল স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েরা কত রকম পিল্ খাওয়া ধরেছে? তোমরা কি জানো না যে সেই সব পিলগুলো কেন তারা খাচ্ছে? জানো না কেন এত ছেলে-মেয়ে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে? জানো না কেন এত অ্যাবরশন হচ্ছে? কেন গর্ভমেণ্ট ক্লিনিক খুলে অ্যাবরশন লিগ্যালাইজ করে দিয়েছে? কেন বাচ্চা ছেলে-মেয়ে বিদেশে বিক্রি করে কোটি-কোটি টাকা উপার্জনের নতুন একটা ব্যবসা এদেশে শুরু হয়েছে? জানো না, যারা এ-ব্যবসা করে টাকা উপায় করছে তাদের ওপর কেন ইন্‌কাম-ট্যাক্স ছাড় দেওয়া হচ্ছে?

অনেকগুলো কথা এক সঙ্গে বলে জয়ন্তী তখন হাঁফাচ্ছে।

বাবা-মাকে তাদের মেয়ের মুখ থেকে এমন কথা একদিন শুনতে হবে তা কখনও তাদের কল্পনাতেও আসেনি। এর পর তাঁরা কী বলবেন তা বুঝতে পারলেন না। ফ্যালফ্যাল করে তাঁরা তখনও মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

একটু দম নিয়ে জয়ন্তী আবার বললে—আমার মুখ থেকে এমন কথা শুনে তোমাদের খুব মন খারাপ হবে, তা আমি জানি। কিন্তু বাবা, আমি চারদিকে যা দেখছি তাই-ই বলছি। তোমরা খবরের কাগজে যা খবর বেরোয় তা পড়েই সব জানতে পারো। কিংবা অফিসের বন্ধু-বান্ধবরা যা বলে তাই-ই শুনতে পাও। কিন্তু আমি তো এ-যুগের মেয়ে। স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েরা যা করছে, যা ভাবছে, যা দেখছে, তা তো তোমরা কেউ জানতে পারছো না। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলেই তাদের সঙ্গে মিশেই আমি যা দেখছি তা-ই আমি তোমাদের বললুম। এর পরেও তোমরা আমাকে ন'হাজার টাকা মাইনে পাওয়া বরের লোভ দেখাচ্ছ?

জয়ন্তীর কথা শুনে সন্তোষবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন—তোদের ক্লাসের মেয়ে-বন্ধুরা সবারই কি এই-ই মনের কথা?

জয়ন্তী বললে—না, তা নয়। তারা এ-সব জেনেও এসব সহ্য করে

যায়। তারা কমপ্রোমাইজ করে নেয়, তারা সবাই আপোষ করে চলে—তারা নরম্যাল মেয়ে—

—তারা যদি নরম্যাল হতে পারে তা তুমিই বা অ্যাব্‌নরম্যাল হতে গেলে কেন? আমরা তোমরা বাবা-মা, আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথাও তো তোমার ভাবা উচিত। আমরা কেউই তো চিরকাল বেঁচে থাকতে আসিনি। আমরা যখন মারা যাবো তখন কে তোমাকে দেখবে?

জয়ন্তী বললে—আমি মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে কে আমাকে দেখতো।

—কিন্তু তুমি তো ছেলে নও, মেয়ে। ছেলে আর মেয়ে কি এক বস্তু?

জয়ন্তী বললে—এইখানেই তোমাদের সঙ্গে আমার মত-পার্থক্য। ছেলেদের বেলায় এক আইন আর মেয়েদের বেলায় কি আলাদা আইন?

সন্তোষবাবু বললেন—আলাদাই তো! ভগবানই তো ছেলেদের আর মেয়েদের আলাদা আলাদা আইন করে দিয়েছেন, আমরা কী করবো?

জয়ন্তী বলে উঠলো—আমি ভগবান-টগবান মানি না। ছেলেদের জন্যে যে-নিয়ম আছে, মেয়েদের বেলাও সেই একই আইন মানতে হবে—

বলে জয়ন্তী তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে। আর কোনও কথা বলার সুযোগই দিলে না সন্তোষবাবুকে।

সন্তোষবাবু আর কী করবেন। তাঁরও বয়েস হয়ে গিয়েছে। তারও রিটায়ার করবার সময় হয়ে এসেছে। চাকরিতে থাকতে থাকতে মেয়ের বিয়েটা দিতে পারলে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। কিন্তু এ কী রকম বেয়াড়া মেয়ে হয়েছে তাঁর? এ সব কথা তাকে কে শেখালে, কোথা থেকে শিখলো তাঁর মেয়ে এ-সব কথা?

তখন অফিসে যাওয়ার তাড়া ছিল তাঁর।

স্ত্রী বললেন—তুমি এখন ও-সব নিয়ে মাথা ঘামিও না। এখন অফিসে যাওয়ার সময় ও-সব কথা ভাবলে তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে মাঝখানে থেকে। কপালে যা আছে তা তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না। তুমি চলে যাওয়ার পর আমি দেখি ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাতে পারি কি না—

সন্তোষবাবু কী আর করবেন। মনের যন্ত্রণা মনে পুষে রেখেই অফিসে চলে গেলেন।

লোকের জীবনে কত রকম অশান্তি থাকে। কারোর অর্থাভাব থাকে, কারোর বা স্বাস্থ্য দুর্বল, সেই দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়ে তার চিন্তার শেষ থাকে না। আবার অনেক লোকের ছেলের চাকরি নিয়ে থাকে দুর্ভাবনা। কিন্তু তাঁর তো ও-সব কিছুই নেই। তাঁর মেয়ে যদি কুরূপা হতো, কুৎসিৎ হতো তা হলেও বা কথা ছিল। কিন্তু জয়ন্তী তো সুন্দরী। সুন্দরীই বলা যায় জয়ন্তীকে। সেই তাকে নিয়ে তাঁর এত দুর্ভাবনা কেন?

আর পিল? ওই সব পিলের কথা ও জানলোই বা কী করে? আর যদি সবাই ওই পিল খায়ও তো তাতে তোর কী? তুই নিজে তো পিল খাচ্ছিস না।

আর সমাজ? সমাজের কথা তোর ভাববার দরকারটা কী শুনি? অন্য ছেলে-মেয়েরা ওই সব পিল খেয়ে গোল্লায় যাচ্ছে তো যাক না। তুই নিজে না-খেলেই হলো। তুই বাপু নিজের আখেরটা গুছিয়ে নে না। তুই নিজে আগে সুখী হয়ে নে, তারপর পরের কথা ভাববি।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে সন্তোষবাবু সামনে এগিয়ে গেলেন। অফিসের দিকে যাওয়ার একটা বাস আসছিল। সামনের দিকে দুটো দরজার ওপর তখন সবাই বাদুড় ঝোলা ঝুলছে। বাসটা থামতেই সন্তোষবাবু সেই ভিড় ঠেলেই ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

একবার ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লে কলকাতার মানুষের আর কোনও কিছু কথা মাথায় ঢোকে না। তখন কোথাও পকেট-মার আশে-পাশে আছে কিনা সেই দিকেই মন চলে যায়। তখন বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ডের আর কিছু মাথায় ঢোকে না।

তখন মা মেয়ের ঘরের দরজায় ধাক্কা দেয় জোরে জোরে।

বলে—ওরে জয়ন্তী, দরজা খোল-দরজা খোল্ রে—ওরে জয়ন্তী—

অনেক অনুরোধ উপরোধের পর তখন জয়ন্তী দরজা খোলে। মা মেয়েকে ধরে বলে—তুই অতো ক্ষেপে গেলি কেন বলতো? নিজের বাবার ওপর অমন করে বলতে আছে? দেখ তো মানুষটা অফিসে যাওয়ার সময় কী রকম মন খারাপ করে গেল। এখন তো তোর বয়েস হয়েছে। এ'ন এমন-ধারা কথা বলতে আছে?

জয়ন্তী প্রথমে কিছু কথা বললে না।

মা আবার জিজ্ঞেস করলে—কীরে, এমন কথা কি বলতে আছে? কথা বলছিস না কেন? আমার কথার জবাব দে?

এবার জয়ন্তীর গলায় কথা বেরোল। বললে—আমার যে রাগ হয়ে যায়—

—কেন, তোর রাগ হয় কেন?

জয়ন্তী বললে—ওই ন'হাজার টাকা মাসকাবারি মাইনের কথা বাবা কেন বললে? আমি কি টাকাকে বিয়ে করবো? আমাকে টাকার লোভ কেন দেখালে বাবা? জানো টাকার লোভে যতোগুলো বিয়ে হয়েছে তার সবগুলোর পরিণতি হয়েছে খুন আর নয়তো আত্মহত্যায়?

মা বললে—বলছিস কী তুই?

জয়ন্তী বললে—হ্যাঁ মা আমাদের ক্লাসের মেয়েরা সব জানে। তাদের মুখ থেকেই শুনেছি। তাদের আত্মীয়-স্বজনদের যেখানেই টাকা দেখে বিয়ে হয়েছে সেখানেই ওই রকম কাণ্ড হয়েছে। আর খবরের কাগজেই তো দেখতে পাও যতগুলো বউকে খুন করার খবর বেরোয় তারা তো সবাই কোটিপতি। কই, গরীব লোকদের বাড়িতে তো অতো বউ খুন হয় না। যেখানে হয় সেখানে ঠিক টাকার জন্যে হয় না, হয় অন্য কোনও কারণে—সে মদ কি মেয়েমানুষ; এই সব কারণে। কিন্তু বড়লোকদের বাড়িতে বউরা যে খুন হয় তা শুধু টাকার জন্যে।

মা আর মেয়ের-এ সব কথা নিয়ে আর কিছু উচ্চ-বাচ্য করলে না। কারণ মা জানতো যে কথায় কথা বাড়ে। কম বয়েসে কম-বেশি সব ছেলেমেয়েই একটু উদ্ধত-প্রকৃতির হয়। আবার বয়েস হলে একদিন তা ঠিকও হয়ে যায়। তা নিয়ে অশান্তি করা ঠিক নয়।

সন্তোষবাবুও স্ত্রীকে বলতেন—ওসব আমরা অনেক দেখেছি, তুমি ও-সব নিয়ে মাথা ঘামিও না। বয়সে বাড়লে সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে। বয়েসেরও তো একটা ধর্ম আছে। আমিও ও-বয়েসে ঠিক করেছিলাম যে বিয়ে-থা না করে রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে সন্ন্যাসী হবো—তা কি হয়েছি!

তা জয়ন্তীকে নিয়ে সন্তোষবাবু আর তাঁর স্ত্রী তারপর থেকে আর কোনও মাথা ঘামাতেন না।

তারপর সেই হায়দ্রাবাদের পাত্রটির সঙ্গে কথা-বার্তা চিঠিপত্র চলতে লাগলো। ন'হাজার টাকা মাস-মাইনের সেই আমেরিকা-ডিগ্রীধারী পাত্র।

জয়ন্তী যতই বলুক জয়ন্তীর বাবা-মা তাঁদের কর্তব্য থেকে কেন বিচ্যুত হবেন? তাঁরা বাপ-মায়ের কর্তব্য করে চললেন। তাঁদের চোখের সামনে ছিল শিবপুরের শ্যামলবাবুর ছোট মেয়ে মৃণ্ময়ীর উদাহরণ। সেই 'মৃণ্ময়ী আয়রন ওয়ার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড' কোম্পানির ফ্যাক্টরির মালিকের স্ত্রী! সেই মৃণ্ময়ীর মতো জয়ন্তী যদি কোনও দিন বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়? তখন? তখন কী হবে?

শ্যামলবাবুর ভাগ্য ভালো। তাঁর মেয়ে পালিয়ে গিয়ে ভাগ্যের জোরে না-হয় বাবার পক্ষে সুখেরই কারণ হয়েছে। শেষ-জীবনে সেই মটর-মিস্ত্রী জামাই-ই তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে, বাড়ি দিয়েছে, গাড়ি দিয়েছে। মানুষ জীবনে যা-যা কিছু কামনাই করে সবই তাঁর হয়েছে। কিন্তু এমন ঘটনা তো সকলের পক্ষে সুখকর হয় না, কল্যাণকর হয় না! শেষ জীবনে তো বেশির ভাগ লোকই ছেলে-মেয়ে বিয়ে নিয়ে মুশকিলে পড়ে। তখন থেকেই তো শুরু হয় তাদের জীবনের চরম অশান্তি। তখন থেকেই তো অনেককে মুখ বুঁজে পুত্র-পুত্রবধূর

লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। তখনই তো তাঁরা কাশী-বাস করে সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলতে চান।

শেষকালে সেই ন'হাজার টাকা মাস-মাইনে পাত্রের বাবা একদিন জয়ন্তীকে দেখতে এলেন। চেহারা দেখেই বোঝা গেল তিনি বেশ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। নিজের বাড়ি আছে শহরে। তিনিই ছেলের জন্যে পোস্ট-বক্স নম্বর দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর নিজের গাড়িতে চড়েই জয়ন্তীকে দেখতে এলেন।

সন্তোষবাবু তাঁর আদর-আপ্যায়নের কোনও রকম ত্রুটি রাখেননি। খাওয়া-দাওয়ার সব রকম ব্যবস্থাই তিনি করেছিলেন। বলতে গেলে তাঁর সাধ্যাতীত ব্যবস্থাই করেছিলেন তিনি।

কিন্তু কোনও কিছুই স্পর্শ করলেন না।

বললেন—এ সব ব্যবস্থা আবার কেন করেছেন ?

সন্তোষবাবু বললেন—এ সামান্য জিনিস, এ আর এমন কী ব্যবস্থা আমি করতে পেরেছি—

দুপক্ষই ভদ্রতা করতে লাগলেন নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা মতো—

বাড়ির ভেতরে তখন মা জয়ন্তীকে নিয়ে হিম্ সিম্ খাচ্ছে। যে-শাড়িটা পরলে জয়ন্তীকে ভালো দেখাবে সেই শাড়িটা কিছুতেই পরবে না সে। যে-ব্লাউজটা পরলে জয়ন্তীকে বেশি মানাবে সে-ব্লাউজটা কিছুতেই সে পরবে না।

মা বললে—আমি তোর ভালোর জন্যেই বলছি রে, কোন্ শাড়ি-ব্লাউজটা পরলে তোকে মানাবে তা আমি জানি না আর তুই তা জেনে ফেলেছিস ? আমার চেয়ে কি তোর বুদ্ধি বেশি বলতে চাস্ ?

জয়ন্তী রেগে গেল মা'র ওপর। বললে—আমি কি পুতুল যে তুমি আমাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে বাজারে পাঠাচ্ছো যাতে আমি ভালো দরে বিক্রী হই ?

মা বললে—তা হলে মেয়ে হয়ে জন্মালি কেন ? এতই যদি তোর অহঙ্কার তাহলে ছেলে হয়েই জন্মাতে পারতিস্।

জয়ন্তী বললে—তা জন্মাবার পরে তোমরা যখন দেখলে যে আমি

মেয়ে হয়েছি তো তোমরা তখনি আমার গলা টিপে আমাকে মেরে ফেললেই পারতে।

মা বললে—এখন তোর এই পাগলামির জবাব দেব না আমি, এখন সে-জবাব দেবার সময় নয়। গালে আর একটু ক্রিম লাগা, গালে খড়ি উঠছে—আমি লাগিয়ে দিচ্ছি, দে কৌটোটা—

জয়ন্তী ক্রিমের কৌটো থেকে আরো একটু ক্রিম মুখে ঘষতে লাগলো।

বললে—যা ভালোবাসি না তাই-ই হয়েছে আমার কপালে—

বলে জিজ্ঞেস করলে—এবার হয়েছে ?

মা আর কী বলবে। জয়ন্তীর মাথার চুলগুলো আরো একটু ঠিক করে দিলে চিরুনী দিয়ে।

ততক্ষণে সন্তোষবাবু সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—কী হলো ? সাজতে এত দেরি কেন ? ওঁরা যে এদিকে তাড়া দিচ্ছেন—

স্ত্রী বললেন—এই তোমার মেয়ে। এই তোমার মেয়ের জন্যেই তো যতো দেরি ভূতের মতোন সেজেছে কেমন, দেখ না—

সন্তোষবাবু বললেন—যা হোক করে তাড়াতাড়ি ওঁরা দেখে নিন, ওঁরা আর দেরী করতে চাইছেন না, ওঁদের অনেক কাজ পড়ে আছে—

তা জয়ন্তীও আর দেরী করলে না। সেই অবস্থাতেই ভদ্রলোকের সামনে এসে বসলো।

সন্তোষবাবু পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন—প্রণাম করো মা, প্রণাম করতে হয় গুরুজনকে—

ভদ্রলোক বিনীত সুরে বললেন—থাক থাক—

—না, প্রণাম করুক ও—বললেন সন্তোষবাবু।

ভদ্রলোকের কথা শুনে জয়ন্তী প্রণাম করতে গিয়েও মাঝপথে থেমে গেল।

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নামটি কী মা ?

জয়ন্তী একটু দ্বিধা করছিল নিজের নামটা বলতে। কিন্তু

সন্তোষবাবু—তাগিদ দিয়ে বললেন—বলো, তোমার নাম বলো—

জয়ন্তী মুখ নিচু করে বসে ছিল। তেমনি মুখ নিচু করেই বললে—কুমারী জয়ন্তী মুখোপাধ্যায়—

ভদ্রলোক বললেন—বেশ বেশ, তুমি কী পড়ছো মা এখন?

জয়ন্তী বললে—আমি সেকেণ্ড ইয়ারে আই-এ পড়ছি—

ভদ্রলোক শুনে শুধু বললেন—বাঃ বেশ—

সন্তোষবাবুর বুক তখন দুরু দুরু করে কাঁপছে। ভদ্রলোক আর কিছু প্রশ্ন করলেন না দেখে সন্তোষবাবু নিজেই বলে উঠলেন-ও লেখা-পড়ায় যেমন ভালো সংসারের কাজ-কর্মও তেমনি করতে পারে। ম্যাট্রিকে ও ইংরাজীতে লেটার পেয়েছিল।

একেবারে চুপ করে থাকলে খারাপ দেখায় বলে ভদ্রলোক বলে ঠলেন—তাই নাকি? বাঃ—

সন্তোষবাবু উৎসাহিত হয়ে আবার বললেন আমার নিজের মেয়ে বলে বলছি না, ওর হাতের রান্না যদি একবার খান তো আপনি কোনও দিন ভুলতে পারবেন না।

ভদ্রোলোক শুধু বললেন—ও—

সন্তোষবাবু বললেন—আমাদের অফিসে শিববাবু বলে এক ভদ্রলোককে একবার বাড়িতে খেতে নেমন্তন্ন করেছিলাম। ওঁর রাঁধা ঘুগনী আর পটলের ডালনা খেয়ে একেবারে চমকে উঠেছিলেন। তাঁর তো বিশ্বাসই হয়নি যে ওইটুকু মেয়ে অমন রান্না করতে পাবে! আর সেলাই-ফোঁড়াই

বলে একটু থামলেন। তারপর আবার বললেন—ওই যে ও যে-ব্লাউজটা পরে আছে ওটা ওর হাতের তৈরি। ব্লাউজের হাতায় যে এম্‌ব্রয়ডারি কাজ করা রয়েছে, ও এমব্রয়ডারি ওর নিজের হাতের…

ভদ্রলোক এবারও শুনে বললেন—বাঃ—

তারপর বললেন—আর মেয়েকে কষ্ট দেবেন না।

সন্তোষবাবু বললেন—না না কষ্ট কীসের? আপনি ওকে আরো দু'চারটে কথা জিজ্ঞেস করুন না। ও সব কথার উত্তর দিতে পারবে।

ও এদিকে খুব স্মার্ট আছে আবার···

ভদ্রলোক এবারে নিজেই উঠলেন। বললেন—না, আমারও দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমাকে আবার একবার বাগবাজারের দিকে যেতে হবে—চলি

তারপর জয়ন্তীর দিকে চেয়ে বললেন—তুমি এবার ওঠো মা, আর তোমাকে কষ্ট দেব না—

জয়ন্তী উঠে চলে যাচ্ছিল।

সন্তোষবাবু হা-হা করে শসব্যস্ত হয়ে উঠলেন—প্রণাম করে যাও, যাওয়ার সময় প্রণাম করে যেতে হয়, এটাও শেখোনি—

জয়ন্তী মাথা নুইয়ে প্রণাম করে চলে গেল।

ভদ্রলোক চলে যাচ্ছেন দেখে সন্তোষবাবু বলে উঠলেন—এ কী, কিছুই তো খেলেন না, পানটা পড়ে রইলো যে। খেয়ে দেখুন মিঠে পান—

বলে পানের ডিবেটা ভাবী বেয়াই-এর দিকে এগিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক তা থেকে একটা পান নিয়ে নমস্কার করে নিজের গাড়িটাতে গিয়ে উঠে চলে গেলেন।

দিন কতক সন্তোষবাবুর খুবই অস্বস্তিতে কাটলো। কিন্তু জয়ন্তীর যেন কোনও মাথা-ব্যথাই নেই সেইজন্যে। যার নিজের বিয়ে তারও তো কিছু উদ্বেগ থাকা উচিত। কিন্তু সে যেন নির্বিকার। যেন যত দায়িত্ব সব কিছু তার বাবা-মা'র।

যখন অনেক দিন কেটে গেল, পাত্রপক্ষের তরফ থেকে কোনও খবরাখবর এলো না, তখন সন্তোষবাবুর একটু ভাবনা হলো। তাই তো, একমাস কেটে গেলে, অথচ কোনও খবর এলো না কেন ওঁদের পক্ষ থেকে! তিনি তো বলে গিয়েছিলেন পরে খবর দেবেন।

স্ত্রী বললেন—তাহলে বোধহয় মেয়েকে পছন্দ হয়নি ওঁদের।

সন্তোষবাবু বললেন—সেটাই সম্ভব। নইলে এত দিনে নিশ্চয়ই একটা খবর আসতো।

তারপর একটু ভেবে বললেন—তোমার মেয়েও যেমন, একটু

সাধারণ ভদ্রতা-জ্ঞানও ওর নেই। গুরুজনকে দেখলে যে প্রণাম করতে হয় সেটাও জানে না তোমার মেয়ে! আমি যখন প্রণাম করতে বললুম তখন প্রণাম করলে। বলো তো, এই সামান্য কথাটাও কি আমাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিতে হবে। ওই সাধারণ জ্ঞানটাও নেই ওর।

তারপর একটু ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন—কী আর বলবো আমারই কপাল!

মা মেয়ের কাছে গিয়ে বললে—হ্যাঁ রে, তুই জানিস না যে গুরুজনকে দেখলে প্রথমেই প্রণাম করতে হয়?

জয়ন্তী বললে—জানি না, কে বললে?

—কে আবার বলবে? তোর বাবাই বললেন!

জয়ন্তী বললে—বাবার সব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি! আমি তো প্রণাম করতুমই, তার আগেই বাবা তড়িঘড়ি করে বললে—প্রণাম কর, প্রণাম কর! যেন আমি জানি না কিছু—

মা বললে—তা ভয় হয় না মানুষের! অত বড়ো পয়সাওয়ালা একজন লোক বাড়িতে এসেছেন, তাঁর মান-অপমানের কথা মানুষ ভাববে না?

জয়ন্তী বললে—তিনি বড়লোক তো তিনি বড়লোক, তাতে আমার কী? তিনি দয়া করে আমায় পছন্দ করলে কি আমি ধেই-ধেই করে নাচবো?

মা বিরক্ত হয়ে যায়। বললে—তোর কথার ছিরি দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। তোকে পছন্দ করলে তো তোরই ভালো, আমাদের কী? আমরা তো চিরকাল বেঁচে থাকবো না। তুই সুখী হলেই তো আমাদের সুখ—

জয়ন্তী বললে—তা আমিই কি চিরকাল বাঁচবো নাকি? চিরকাল কেউ বাঁচে? কিন্তু তা বলে বড়লোক হলেই তা পা চাটবো এমন আহাম্মক আমি নই, তাতে আমার বিয়ে হোক আর না-ই হোক!

●●●

তাই বলছিলাম শেষ পর্যন্ত সে এলো।

অথচ আগে এলে আমার আত্মীয়-স্বজন কতো খুশী হতো। আমার বাবা-মা কতো আনন্দ পেত। তারা কতো আশা করেছিল যে একদিন সে আসবে। আমাদের বাড়িতে এলে আমাদের বাড়ি আলো হয়ে যাবে।

কিন্তু এখন মনে হয় সে না এসে হয়তো ভালোই করেছে, সে এলে তো আর জানতেই পারতুম না যে, আমরা কত অন্যায়, কত অত্যাচার, কত অবিচার, কত অনাচার আমাদের গ্রাস করে চলেছে। কত হিংসে, কত কালো টাকা, কত পাপ আমাদের সমাজের গভীরে শেকড় গেড়ে দিয়েছে!

একদিন তো ওকে ঘরে নিয়ে আসবার জন্যে আমি নিজেই কতো উদ্যোগ নিয়েছি। শেষে চরম অপমানও সহ্য করেছি ওর জন্যে। কিন্তু সেদিন তো সে কিছুতেই আসেনি। অথচ আজ সে এলো। আর এমন ভাবে এলো যখন আমি তার কথা ভুলেই গিয়েছিলুম, যখন তার আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম।

এর চেয়ে পরমাশ্চর্য আর কী হতে পারে।

আমি সব শুনে জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

—তারপরের আগেও তো তারপর আছে। সেই তারপরের আগের ঘটনাটা যা জানি তাই-ই তোকে এখন বলি।

শেষ পর্যন্ত আমার বেলায় যা হচ্ছিল সেবারেও তাই-ই হয়েছিল। সে ন'হাজার টাকা মাসকাবারি মাইনে পাওয়া পাত্রের বাবা একদিন চিঠি লিখে জানালেন যে পাত্রী তাঁদের পছন্দ হয়েছে। অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে এবার আলোচনা করতে তাঁরা রাজি!

সন্তোষবাবু সেই চিঠি পেয়ে আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে চিঠিটা নিয়ে এসে স্ত্রীকে দেখালেন।

বললেন—এই দেখো—

স্ত্রীও চিঠিটা পড়লেন। পড়ে তাঁরও আনন্দ আর ধরে না। হাতে স্বর্গ পেলে মানুষের কী-রকম অনুভূতি হয় তা সংসারের কোনও মানুষই

জানে না। কিন্তু সেদিন জয়ন্তীর মা আর বাবার মনের যে-রকম অবস্থা হলো তার সঙ্গে হাতে স্বর্গ পাওয়ার উপমাটাই একমাত্র প্রযোজ্য। সঙ্গে সঙ্গে মা জয়ন্তীর কাছে গিয়ে চিঠিটা দেখালে।

বললে—দেখলি তো, এই চিঠিটা পড়ে দেখ। কী লিখেছেন ভদ্রলোক, দেখ—

জয়ন্তী চিঠিটা পড়লে। তারপর চিঠিটা মাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললে—

তবে আর কী? ধেই ধেই করে নাচো তোমরা—

মেয়ের কথা শুনে মার আগা-পাশ্-তলা জ্বলে উঠলো। বললে—তোর কপালে অনেক দুঃখু আছে রে, অনেক দুঃখ আছে তোর কপালে। যাক্ গে আমরা আর ক'দিন! আমরা মরে গেলে তো আর দেখতে আসছি নে। তবে এই বলে রাখছি যে তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে—

এর পরে মা আর মেয়ের সামনে দাঁড়ালো না। সেখান থেকে চলে গিয়ে সন্তোষবাবুর কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনাটা সবিস্তারে বললে।

সন্তোষবাবু বললেন—যা হোক, তুমি কিছু ভেবো না। যার কপালে যা আছে তা হবেই। আমি আর কী বলবো, আর তুমিই বা কী বলবে? এমন মেয়ে, তুমি পেটে ধরেছিলে

বলে কথাটা আর শেষ না করে বাথরুমে চান করতে ঢুকে পড়লেন।

তারপর ছেলের বাপকেও চিঠি দিলেন সন্তোষবাবু। লিখে দিলেন যে তাঁর মেয়েকে পছন্দ হয়েছে এটা জেনে তিনি খুব খুশী। এবার তাঁদের দাবী-দাওয়া কী আছে সে সম্বন্ধে জানালে ভালো হয়। কারণ তাহলে তিনিও সে-বিষয়ে তৈরি হতে পারেন।

চিঠি-পত্র চলছে, ঠিক এই অবস্থায় একটা অপ্রিয় কাণ্ড ঘটলো। কাণ্ডটা ঘটলো বড় হঠাৎ।

সন্তোষবাবু সেদিন অফিস থেকে ফিরছেন, বাস ধরবার জন্যে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন হঠাৎ একটা প্রাইভেট কার সামনে এসে দাঁড়ালো।

—কে ? সন্তোষ না ?

ভেতর থেকে কে যেন তাঁকে ডাকলো।

প্রথম চিনতে পারেননি সন্তোষবাবু।

ভেতর থেকে একজন ভদ্রলোক আবার তাঁকে ডাকলে—আরে, আমায় চিনতে পারলি না ? আমি সলিল রে!

সন্তোষবাবু চমকে উঠলেন। সেই সলিল চৌধুরী ?

তিনিও বলে উঠলেন—আরে সলিল, তুই ? তুই হঠাৎ কোত্থেকে ? তুই তো সেই হায়দ্রাবাদে ছিলি। কলকাতায় কবে এলি ?

সলিল বললে—গাড়িতে ওঠ।

সন্তোষবাবু ভেতরে উঠে বসতেই গাড়িটা ছেড়ে দিলে।

সলিল জিজ্ঞেস করলে—তোর এখন কোনও কাজ নেই তো ?

—কেন ?

—তাহলে আমার হোটেলে চল্। আমি অফিসের কাজে সাতদিনের জন্যে কলকাতায় এসেছি। এর মধ্যে পাঁচ দিন কেটে গেছে। পরশুই চলে যাবো হায়দ্রাবাদে। তার আগে তোর সঙ্গে দেখা করে না গেলে বড্ড খারাপ লাগবে।

সন্তোষবাবু বললেন—এতদিন পরে দেখা, কিন্তু তুই তো চিনতে পেরেছিস ঠিক। আমি কিন্তু প্রথমটায় মোটেই চিনতে পারিনি—

সলিল বললে—তুই আমাকে চিনতে পারবি কী করে ? আমি যে অনেক মোটা হয়ে গিয়েছি। তুই কিন্তু ঠিক সেই রকমই আছিস—

বলতে বলতে গাড়িটা পার্ক স্ট্রীটের একটা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর সলিল গাড়ি ছেড়ে দিয়ে তাকে টানতে টানতে একেবারে লিফটের সামনে নিয়ে গেল। সেখান থেকে সোজা নিজের ঘরে।

—তারপর ? কী খবর বল্ ?

সন্তোষবাবু বললেন—তুই পাঁচদিন কলকাতায় আছিস, একটা খবর পর্যন্ত দিতে পারলি না ? আমার বাড়ির ঠিকানা তো তুই জানতিস্, আর অফিসের ঠিকানা টেলিফোন নম্বর সবই তো তুই জানতিস।

সলিল বললে—আরে তুই সরকারি অফিসে চাকরি করিস, সেখানে কাজ না করলেও চলে। কাজ না করলেও মাইনে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদেব তো তা নয়। প্রাইভেট সেক্টারে যারা কাজ করে তাদের অবস্থা যদি জান্‌তিস তাহলে বুঝতিস কাকে বলে কাজ। এখানে নাকে দড়ি দিযে খাটিযে নেয়।

সলিল চা খেতে খেতে তার চাকরির দুঃখকষ্টের কথা বলে যাচ্ছিল। বলছিল—আমবা ব্রিটিশ আমলেও অফিসে কাজ করেছি, আবার এখন দিশী আমলেও কাজ কবছি। তখন ভাই কাজ করে সুখ ছিল। আর এখন? এখন নতুন জেনারেশনের ছেলেরা এসে আমাদের মাথার ওপর বসিয়ে দিচ্ছে। তারা যতটা না কাজ করে তার দশগুণ বেশি ভড়ং করে। এখন বুড়ো বযসে মানে মানে রিটায়ার করতে পারলে বাঁচি—

সন্তোষবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তোর ছেলে-মেয়ে কী করছে?

সলিল বললে—মেয়ে দুটোর বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। আর একটা মাত্র ছেলে, সে এখন ডাক্তারি পড়ছে। সে পাশ করে বেবোবে এই বছর। তারপর প্র্যাকটিশ কবতে আবম্ভ করলেই আমার ছুটি। তখন যা হয় হবে। কিন্তু এখন আমাব চাকরি রাখতে পারবো কি না সেইটেই হয়েছে আমার সমস্যা—

—কেন? চাকরি রাখতে পারবি না কেন?

আরে, আমাব মাথার ওপর এমন একজন ছোকরাকে বসিয়ে দিয়েছে যে দিনরাত মদ খায়। নিজের অফিসে বসেই মদ খায়। আজকাল ওই তো একটা ফ্যাশান হয়েছে।

সন্তোষবাবু অবাক হয়ে গেলেন সলিলের কথাগুলো শুনে।

বললেন—অফিসের টেবিলে বসে মদ খেলেও চাকরি থাকে?

সলিল বললে—চাকরি থাকে ভাই, আজকাল চাকরি থাকে। আমি বলছি না যে লোকটা কাজ জানে না। আমেরিকা থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী নিয়ে এসেছে। সুতরাং গুণী ছেলে। কিন্তু ওই এক দোষ, কেবল মদ খাবে—

সন্তোষবাবু বললেন-তা কাজ যখন ভালো জানে তখন মদ

খেলেই বা ক্ষতি কী?

সলিল বললে—শুধু কি মদ রে? তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক আরো সব কিছু আছে যে—

—আনুষাঙ্গিক সব কিছু মানে?

সলিল বললে—আনুষঙ্গিক মানে মেয়েমানুষও আছে। অথচ এখনও বিয়েই হয়নি। অথচ ফার্মের মালিকরা একেবারে ধীরাজ গাঙ্গুলী বলতে অস্থির ...

—ধীরাজ গাঙ্গুলী?

সলিল বললে—হ্যাঁ, ধীরাজ গাঙ্গুলী। তুই চিনিস নাকি?

সন্তোষবাবু নামটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। তাঁর মুখ থেকে আর তখন কোন কথা বেরোচ্ছে না। বললেন—তোর ধীরাজ গাঙ্গুলী কি মাসে ন'হাজার টাকা মাইনে পায়?

– হ্যাঁ, কিন্তু তুই কী করে তাকে চিনলি?

সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সন্তোষবাবু পাল্টা প্রশ্ন করলেন—তার বাবার নাম কি বিকাশ গাঙ্গুলী?

সলিল আরো অবাক। বললে—হ্যাঁ, কিন্তু তুই তাকে চিনলি কী করে?

সন্তোষবাবু বললে—ভাই সলিল, তোর সঙ্গে যে আজ দেখা হয়ে গেল, এর পেছনে ভাই নিশ্চয় ভগবানের হাত আছে—

—কেন? কেন? তুই ও-কথা বলছিস কেন?

সন্তোষবাবু তখন বসলেন না। বললেন—তুই জানিস না অজান্তে আমার কী উপকার করলি। ওই বিকাশ গাঙ্গুলীর ছেলে ধীরাজ গাঙ্গুলীর ন'হাজার টাকা মাইনের কথা শুনেই আমি ভুলে গিয়েছিলুম।

- কেন? কেন?

সন্তোষবাবু বললেন—আমার একমাত্র মেয়ে জয়ন্তীর সঙ্গে ভাই ওই ধীরাজ গাঙ্গুলীর বিয়ের কথা একেবারে পাকা হয়ে গিয়েছিল, তুই আজ আমাকে বাঁচালি ভাই! তোকে আজ আমি কী বলে ধন্যবাদ জানাবো বুঝতে পারছি না। আমি আজ আসি ভাই, বাড়িতে স্ত্রীর

কাছে খবরটা না-দেওয়া পর্যন্ত আমি শান্তি পাচ্ছি না—

বলে সন্তোষবাবু ঘর থেকে উঠে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল। সলিলও বাইরে বেরিয়ে এল তার সঙ্গে। বললে - কী রে, তুই অমন করছিস কেন?

সন্তোষবাবু বললেন—তুই জানিস না ভাই তুই আমার কী উপকার করলি, তোর সঙ্গে দেখা না হলে আমার সর্বনাশ হয়ে যেত! জানিস, ওই আমার একমাত্র মেয়ে। আমি ভাই ন'হাজার টাকা মাইনের কথা শুনেই আনন্দের চোটে লাফিয়ে উঠেছিলুম—তুই আমার ভুল ভাঙালি আজ—

সলিল বললে—তুই আর বসবি না?

সন্তোষবাবু বললেন—না ভাই, আজ বাড়ি গিয়ে গিন্নিকে কথাটা না-বলা পর্যন্ত আমার শান্তি হচ্ছে না।

সলিল বললে—দেখ ভাই, আমিও দুটো মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তাদের বিয়ের ব্যাপারে জামাইদের মাইনের দিকটায় আমি কখনও নজর দিইনি। ভেতর থেকে শুধু খবর নিয়েছি পাত্রদের স্বভাব চরিত্র কেমন, আর কিছু দেখিনি। কারণ কী জানিস?

—কী?

সলিল বললে—এ যুগটা একেবারে বদলে গেছে। এখন ভালো-মাইনে পাওয়া ছেলে মানেই চরিত্রহীন ছেলে। কারণ তাদের মধ্যে সবাই-ই হলো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়া ছেলে। তার চেয়ে গরীব গ্রামের ছেলেরা অনেক ভালো, তারা এখনও মর‍্যাল-ভ্যালুর ওপর বিশ্বাস রাখে।

সন্তোষবাবু বললেন—তা তেমন একটা পাত্রের সন্ধান যদি পাস তো আমাকে খবর দিস না।

সলিল বললে—ঠিক আছে, আমি খবর পেলেই তোকে জানাবো—

খবরটা শুনেই স্ত্রী বললে—ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে তোমার বন্ধুর দেখা হয়ে গিয়েছিল, নইলে কী সব্বোনাশ হতো বল দিকিনি—

সন্তোষবাবু বললেন—তুমি কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে গিয়ে কালকেই পুজো দিয়ে এসো। শুধু মদ নয়, তার সঙ্গে আবার মেয়েমানুষের ব্যাপার। আমি তো ভাবতেই পারছি না—আর বেশি টাকা মাইনে পাওয়া পাত্রের কথা মুখে এনো না তুমি। জয়ন্তী তো ঠিকই বলেছিল—

স্ত্রী বলে উঠলো—চুপ চুপ, অত জোরে জোরে কথা বোল না, জয়ন্তী পাশের ঘরেই রয়েছে, শুনতে পাবে।

এই জয়ন্তীর সঙ্গেই যে সুজয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হলো, সে অনেক পরের কথা। কিন্তু আগেও আরো অনেক পাত্রের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ চলছিল। এক-একজন পাত্রের এক-এক রকম দাবী। কেউ টাকা চায়, পণ চায়। মোটা টাকাব পণ।

এই পাত্রের খবর প্রথমে একজন ঘটক এনেছিল।

প্রথমে পাত্রের কাকা দেখতে এলেন। কারণ পাত্রের বাবা অনেক দিন আগেই মারা গেছেন। আর কাকাই অভিভাবক। জয়ন্তী যেমন সেবারে সেজে-গুজে এসেছিল, এবারেও তাই। কিন্তু এবারের পাত্র সব মিলিয়ে আটশো টাকা মাইনে পায়। সাধারণ মধ্যবিত্তের বংশ। তবে কলকাতায় নিজেদের বাড়ি নেই। ভাড়া বাড়ি। দু'জন ছোট বোন আছে। তাদের বিয়ে দিতে হবে। এত রকম সমস্যা পাত্রের কাকার। তাই তিনি ভাইপোর বিয়ে দিয়ে ফেলতে চান।

জয়ন্তী এমন পাত্রী নয় যাকে দেখলে কারো অপছন্দ হবে।

যে-সব প্রশ্ন ভাবী পাত্রীকে সবাই করে সেই সব প্রশ্নই করলেন পাত্রের কাকা নিজে।

অর্থাৎ লেখা-পড়া কেমন করছে। কী কী রান্না করতে পারে পাত্রী। কী কী খাবার খেতে ভালোবাসে। দেশের হালচাল সম্বন্ধে তার অভিমত। কোন রাজনীতিক পাটির সে সমর্থক।

আজে-বাজে অনেক প্রশ্নের পাহাড়।

সব প্রশ্নের জবাবই দিলে জয়ন্তী। কিন্তু গলায় যেন একটু বিরক্তির সুর। কিন্তু তবু তার দিক থেকে কোনও বিদ্রোহের বা

অভদ্রতার লক্ষণ পাওয়া গেল না।

সন্তোষবাবু মেয়ের ব্যবহারে একটু খুশীই হলেন। পাত্রের কাকাকেও দেখে যেন বেশ খুশী খুশী মনে হলো। তারপর এক সময়ে জয়ন্তী পাত্রপক্ষকে প্রণাম করে ভেতরে চলে গেল। পাত্রপক্ষের তরফ থেকে যথারীতি বলা হলো পরে ঘটক মারফৎ খবর দেওয়া হবে।

পরের দিনই ঘটক দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির।

সন্তোষবাবু উদগ্রীব হয়েই অপেক্ষা করছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন—কী খবর বলো? পাত্রী পছন্দ?

ঘটকমশাই বললে—আপনার মেয়েকে কে অপছন্দ করবে বলুন?

সন্তোষবাবু বললেন—ও-সব ছেঁদো কথা শুনতে চাই না। তাঁরা কী বললেন, তাই বলো—

ঘটকমশাই বললে—পাত্রের কাকা বললেন মেয়ে তাঁদের খুব পছন্দ হয়েছে—

—আর? আর কী বললেন? বিয়ের তারিখ টারিখ কিছু বলেছেন?

ঘটক বললে—সেসব কথা কিছু বলেননি।

সন্তোষবাবু বললেন—সেই কথাই যদি আদায় করতে না পেরে থাকো, তাহলে সাত তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসে লাভ কী? তুমি যেদিন পাকা খবর আনবে সেইদিনই আমি তোমাকে আলাদা পঞ্চাশ টাকা নগদ দেব।

ঘটকমশাই চলে গেল। তারপর থেকে যা হয় তা-ই হতে লাগলো। তিনি আবার ঘটককে ডেকে পাঠালেন। ঘটক এলে জিজ্ঞেস করলেন-কী হলো? তোমার তো আর পাত্তাই নেই তার পর থেকে?

ঘটক বললে—আমি অন্য কাজে একটু ব্যস্ত ছিলুম, তাই আর ওঁদের বাড়ি যেতে পারিনি—

সন্তোষবাবু বুঝলেন ঘটকটা একটু প্যাঁচ কষে টাকা আদয়ের চেষ্টা করছে। তিনি আর কিছু বাক্যব্যয় না করে একটা পাঁচ টাকার

নোট ঘটকের হাতে তুলে দিতেই সে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। বলে গেল—দু'এক দিনের মধ্যেই সে পাকা খবর নিয়ে হাজির হবে।

দুদিন কেটে গেল। তৃতীয় দিনও অধীর আগ্রহে কোনও রকমে কেটে গেল। স্ত্রী বললে—মনে হয় ওঁরা বোধহয় আর আসবেন না—

সন্তোষবাবুরও তা-ই ধারণা হচ্ছিল।

স্ত্রীর কথা শুনে বললেন—তাঁরা না-আসবেন না-এলেন। কিন্তু ঘটক ব্যাটা কী রকম নেমকহারাম বলো তো। আমি তাকে নগদ পাঁচটা টাকা দিলুম, তবু ব্যাটার কী রকম আক্কেল দেখলে? কী যুগই পড়লো বলো তো? কাউকেই কি বিশ্বাস করতে পারা যাবে না?

শেষকালে আবার ঘটকের বাড়িতে যেতে হলো সন্তোষবাবুকে নিজেকে। কত কষ্ট করে গেলেন, কিন্তু তাতে কোনও লাভ হলো না।

ঘটকের বউ বললে তিনি তো বাড়িতে নেই, ভোরবেলাই কাজে বেরিয়ে গেছেন—

সন্তোষবাবু বললেন—তাহলে তাকে বলে দেবেন যে সন্তোষবাবু এসেছিলেন তাঁর মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে।

—আর কিছু বলতে হবে?

সন্তোষবাবুর তখন রীতিমত রাগ হয়ে গেছে।

বললেন—আর বলবেন তিনি যেন অতি অবশ্য আজকালের মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করেন।

বলে রাগতে রাগতে বাড়ি চলে এলেন। একে মন খারাপ, তার ওপর বাড়ি আসতে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে গেলেন। ছাতা সঙ্গে নিয়ে যাননি! কিন্তু কে ভাবতে পেরেছিল যে অসময়ে এমন অঝোর-ধারায় বৃষ্টি নামবে!

সেদিন আর খাওয়া হলো না সময়ের অভাবে!

স্ত্রী বললেন—তুমি একটা ছাতা নিয়ে বেরোবে তো। দেখতো, কী রকম ভিজে গেছ একেবারে—

সন্তোষবাবু বললেন—আজকে আর আমি ভাতটাত কিছু খাবো না—খেতে গেলে আবার অফিসে লেট হয়ে যাবে—

স্ত্রী বললেন—একটু কিছু মুখে না দিয়ে গেলে যে তোমার অসুখ করবে।

সন্তোষবাবু অফিসের জামা-কাপড় পরতে পরতে নিজের মনেই বলে উঠলেন—করুক গে অসুখ, তোমার মেয়ের জন্যে খেটে খেটে আমার মরে যাওয়াই ভালো—

স্ত্রী বললেন চুপ চুপ, আস্তে আস্তে বলো, পাশের ঘরেই জয়ন্তী রয়েছে, শুনতে পাবে আবার—

—শুনুক গে, শুনলে তো আমার বয়েই গেল! মেয়ের জন্ম দিয়ে আমি যেন পাপ করেছি—

বলতে বলতে না খেয়ে সন্তোষবাবু দৌড়তে দৌড়তে অফিসে চলে গেলেন। এ-রকম ঘটনা একদিন নয়। যেদিন থেকে মেয়ের বিয়ের বয়েস হয়েছে সেদিন থেকে একটা-না একটা ব্যাপারে সন্তোষবাবু এইরকম উপোষ করে অফিসে গেছেন। যা'হোক, একদিন সেই ঘটক অবশ্য এলো।

ঘটককে দেখেই সন্তোষবাবুর আগা-পাশতলা জ্বলে উঠলো।

বললেন—কী গো, এতদিন পরে তোমার দেখা করার সময় হলো?

ঘটকমশাই বললে—একটা ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলুম তাই আসতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল।

—তা আমাকে একটা খবর দেওয়ারও সময় হয়নি তোমার? আমি যে তোমার পাওনার চেয়েও পাঁচটা টাকা বেশী তোমাকে দিয়েছিলুম, তা তোমার মনে ছিল না?

ঘটক বললে—আমি তো বলছি একটা মস্ত ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলুম বলে আসতে পারিনি—

সন্তোষবাবু রেগে গেলেন। বললেন—ঝামেলা? ঝামেলা শুধু একলা তোমারই আছে, আর কারো নেই? সংসারে কার ঝামেলা নেই বলো তো? তুমি আমাকে একটা মানুষ দেখাতে পারো, যার ঝামেলা নেই?

তারপর এক সেকেণ্ড থেমে আবার বললেন—তুমি জানো তোমার

বাড়িতে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে আমার নিউমোনিয়ার মতো হয়ে গিয়েছিল! সে খবর তুমি রেখেছ?

এবার ঘটকমশাই আর কোনও উত্তর দিলে না। চুপ করে রইলো।

সন্তোষবাবু জিজ্ঞেস করলেন—সেই পাত্রের কাকা কিছু খবর দিয়েছেন?

—হ্যাঁ!

—কী খবর? মেয়ে পছন্দ হয়েছে?

ঘটক বললে—মেয়ে পছন্দ হয়েছে। কিন্তু…

—কিন্তু কী?

ঘটক বললে—ওঁরা কিছু নগদ চান—

নগদ? নগদ চান?

ঘটক বললে—হ্যাঁ। পাত্রের তো নিজের বাবা নেই। পাত্রের কাকাও ছাপোষা মানুষ। তাঁর নিজেরও দুটো মেয়ে আছে আইবুড়ো। তাদের বিয়ে দিতে হবে। তার সঙ্গে পাত্রেরও দুটো আইবুড়ো বোন আছে। তারাও ঘাড়ের ওপর রয়েছে। তাদেরও আজ-কালের মধ্যে বিয়ে দিতে হবে। তাই…

—তাই কী? তাই নগদ চাই? কত?

ঘটক বললে—এই হাজার পনেরোর মতো—

সন্তোষবাবু এবার রেগে উঠলেন। বললেন হাজার পনেরো যদি নগদই দিতে পারবো তাহলে আমি ওই আটশো টাকা মাইনে পাওয়া পাত্রের সঙ্গে আমার মেয়ের সম্বন্ধ করবো কেন? অত টাকা দিতে গেলে আমার এই ভিটে-বাড়ি বন্ধক দিতে হবে। তা আমি পারবো না। বাড়ি বাঁধা দিয়ে আমি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে রাজি নই। তাতে আমার মেয়ের বিয়ে হোক আর না হোক। এই আমার সাফ কথা। তুমি গিয়ে পাত্রের কাকাকে এই কথা বলে দিও, যাও—

ঘটক আর কী বলবে, চলে গেল। সন্তোষবাবু তার মুখের ওপরেই দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

স্ত্রী বুঝতে পেরেছিলেন জয়ন্তীর বিয়ে নিয়ে কিছু হয়েছে। ঘটক চলে যেতেই কাছে এলেন তিনি। বললেন—আবার কী হলো ?

সন্তোষবাবু বললেন—দেখ না, ওই তো পাত্র। সব মিলিয়ে আটশো টাকা মাত্তোর মাইনে পায়, তারই আবার খাঁই কতো!

বলে সমস্ত ঘটনাটা সবিস্তারে বললেন। এ-কথার পর স্ত্রী আর কী বলবেন। তিনি রান্নাঘরে যে কাজ করছিলেন সেই কাজেই আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সন্তোষবাবু খেয়ে-দেয়ে গম্ভীর মুখে অফিসে চলে গেলেন।

তাই বলছিলাম শেষ পর্যন্ত সে এলো।

অথচ কত বছর আগেই তো আসবার কথা ছিল। আমার বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন সবাই তো আশা করেছিল একদিন সে আসবে। আমাদের সংসার আলো করে দেবে সে এসে।

অথচ সেদিন আমার মনে হলো সে যেন তখন না এসে ভালোই করেছে। সেদিন সে এলে তো বুঝতেই পারতুম না যে আমাদের দেশে আমরা কত অন্যায়, কত অনাচার, কত অত্যাচারের মধ্যে আমরা বাস করছি। কত ঘুষ, কত কালো টাকা, কত হিংসে, কত লোভ আমাদের গ্রাস করে চলেছে।

আমি তখনও বুঝতে পারছি না সুজয় আমাকে এত অবান্তর কথা বলছে কেন ? এ-সব কথার সঙ্গে তার জীবনের সঙ্গে কী সামঞ্জস্য আছে। কী সঙ্গতি আছে অতকাল আগেকার সেই জয়ন্তীর ? আজ এতদিন পরে সেই জয়ন্তীর কথা বললে কেন সুজয় আমার কাছে এসে ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম—এতকাল পরে আবার সেই জয়ন্তীর কথা আমাকে বলছিস কেন ? আবার কি সেই জয়ন্তীর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে নাকি ?

সুজয় বললে—হ্যাঁ।

—কোথায় ?

সুজয় বললে—তা বলতে গেলে আমাকে যে আরো অনেক আগেকার কথাও বলতে হবে। তা না বললে যে তুই কিছুই বুঝতে পারবি না। আমার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ হওয়ার অনেক আগেকার কথাও যে বলতে হবে। সেই সব কথা আগে বলি তাহলেই তুই সব বুঝতে পারবি। সেইসব কথা তো আগে আমি জানতাম না। সেই সব কথা এখন তোকে বলি।

জয়ন্তীর কলেজের ক্লাশ-ফ্রেণ্ডদের একে একে অনেকের বিয়ে হয়ে গেল। তাতে জয়ন্তীরও নেমন্তন্ন হলো।

জয়ন্তী মঞ্জুলাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলে—এ বিয়েটা কী করে হলো রে ? লাভ-ম্যারেজ, না নেগোশিয়েটেড ?

মঞ্জুলা বললে—কী জানি, হয়তো সম্বন্ধ করেই হয়েছে, কেন ? ও-কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন ?

জয়ন্তী বললে—জিজ্ঞেস করছি, তার কারণ আছে। যদি সম্বন্ধ করে বিয়েটা হয়ে থাকে তো নিশ্চয়ই ডাওরী দিতে হয়েছে, যৌতুক দিতে হয়েছে।

—তা যৌতুক দিলে ক্ষতিটা কী ?

ক্ষতিটা যে কী তা জয়ন্তী যদি সকলকে বোঝায়ও তবু হয়তো কেউ তা বুঝতে পারবে না। পাত্রীর বাবা পাত্রকে যে-সব দান-সামগ্রী দিয়েছিল তাও কিছু কম ছিল না। রেফ্রিজারেটার থেকে আরম্ভ করে সব রকম বিলাসদ্রব্য। তখনকার দিনে ফ্রিজটা নতুন জিনিস। এখনকার মত অপরিহার্য নয়। কিন্তু সে-যুগেও যখন অতো দামী জিনিস পাত্রকে উপহার দেওয়া হয়েছে তখন নগদে কয়েক হাজার টাকা নিশ্চয়ই দেওয়া হয়েছে। সেই চিন্তাতেই জয়ন্তী সব সময়ে মানসিক হিসেবে ব্যস্ত ছিল। বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা আপ্যায়নের ব্যবস্থাও ছিল ত্রুটিহীন। সেখানেও কন্যাকর্তার তরফ থেকে নিজের ঐশ্বর্য প্রদর্শনের একটা নির্লজ্জ বিজ্ঞাপনী-মনোভাব কাজ করছিল।

জয়ন্তীর অনবরত একই কৌতুহলী প্রশ্নের উত্তরে মঞ্জুলা বলেছিল

—তোর মনের ভেতরে বোধহয় একটা পোকা আছে—

—পোকা? কীসের পোকা?

মঞ্জুলা বলেছিল—রোগের পোকা। নইলে সবাই যখন আনন্দ করছে, হৈ-হুল্লোড় করছে তখন তোর মাথায় ওই সব ভাবনা কেন ঢুকছে? বাপ যখন মেয়ের জন্ম দিয়েছে তখন তো ধরেই নিয়েছে যে তার মেয়েটা একটা লায়েবিলিটি। বাবার খরচের খাতাতেই তখন মেয়ের নামটা লেখা হয়ে গিয়েছে।

মঞ্জুলার কথাটা কখনও জয়ন্তী নিজের মনে সুস্থভাবে মেনে নিতে পারেনি। এ-রকম কেন হবে? এটা তো অন্যায়, এটা তো অনাচার! যে-পাত্র বা যে-পাত্রের বাবা তার ছেলের বিয়ের আগে নানা বাহানা করে পাত্রীর বাবার কাছ থেকে চাপ দিয়ে টাকা আদায় করে, সে-পাত্রের বাবা বা সে-পাত্র কী করে নিজের বাড়িতে সেই নতুন বউকে রাতারাতি নিজের পরমাত্মীয় বলে মেনে নেবে? একদিন আগে যে পর ছিল কিছু টাকার কল্যাণে ঠিক পরদিনই সে কী করে আপন হয়ে যেতে পারে? টাকার কি এতই মহিমা?

জয়ন্তীর মাথায় এ-পোকা কে ঢোকালো? অন্য সব মেয়েই তো তার আগে এ ব্যাপারটা মুখ বুঁজে মেনে নিয়েছে! তাহলে সে একলাই বা কেন সেটা মানবে না?

একদিন মা'কে একলা পেয়ে জয়ন্তী জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা মা, বিয়ের আগে কি তোমার বাবা আমার বাবাকে পণ কিংবা যৌতুক দিয়েছিলেন?

মা তো মেয়ের কথা শুনে অবাক।

জয়ন্তী আবার বললে—বলো না মা, বলো না। আমার জানতে বড় ইচ্ছে করছে। আমার বাবা কি বিয়ের সময়ে তোমার বাবাকে সোনার বোতাম, হীরের আংটি, কয়েক হাজার নগদ টাকা দিতে চাপ দিয়েছিল?

মা এর কী জবাব দেবে?

তবু মেয়ে নাছোড়বান্দা। বললে—বলো না মা, বলো না?

এর জবাব না দিলে আমি তোমায় ছাড়বো না—

মা নানা কাজের দোহাই দিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল।

কিন্তু জয়ন্তী ছাড়লো না। জয়ন্তী মা'র পেছনে লেগে রইলো। কিছুতেই পেছু ছাড়বে না। তার মুখে ওই একই কথা বার বার উচ্চারিত হতে লাগলো।

—নাকি তোমাদের লাভ-ম্যারেজ? বলো না মা?

তারপর খেতে ডাকবার সময়ও খেতে এলো না জয়ন্তী। বললে—তুমি আমার কথার জবাব না দিলে আমি আজ খাবোই না। আমি উপোষ করে মরবো—

এ তো মহা মুশকিলে পড়া গেল মেয়েকে নিয়ে। সন্তোষবাবু তখন অফিসে। জয়ন্তীরও কলেজ ছুটি।

মা জয়ন্তীর ঘরে এসে বললে—কী রে, খাবি না তুই?

জয়ন্তী বললে—তুমি আমার কথার জবাব না দিলে আমি কিছুতেই খাবো না।

মা বললে—তোর সে-সব কথা শুনে কী লাভ শুনি? আর অতকাল আগের কথা কি আমারই এখন মনে আছে ছাই? এ কি আজকের কথা?

জয়ন্তী বললে—দেখ মা, আমি জানতে চাই কী করে তোমাদের বিয়ে হলো, কত টাকা তোমার বাবা আমার বাবাকে পণ দিলেন। সমস্ত কথা আমার জানতে ইচ্ছে করছে—সমস্ত দিন—

মা বিরক্ত হয়ে উঠলো মেয়ের পীড়াপীড়ি দেখে। বললে—হ্যাঁ রে, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? তোদের-এ যুগ আর আমাদের সে-যুগ কি এক হলোরে? আমি না তোর মা? আমাকে এ-সব কথা কি জিজ্ঞেস করতে আছে? তোর লজ্জা হচ্ছে না ও সব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করতে? আমি কি কখনও আমার শ্বশুর-শাশুড়ীকে এ-কথা জিজ্ঞেস করতে পারতুম, না জিজ্ঞেস করতে সাহস হতো।

তারপর একটু থেমে বলল—নে, খা, খেয়ে নে—

জয়ন্তীর যেন খেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু মা'র কথায় খেতে বসলো। বললে—মা, আমি জানি মেয়ে হয়ে মা-বাবাকে এ-সব কথা জিজ্ঞেস করতে নেই। কেউই তা করে না, কিন্তু আমি কেন এ-রকম হলুম মা? কে আমাকে এ-রকম করলে মা? কেন আমি সাধারণ হতে পারলুম না? কেন আমি স্বাভাবিক হতে পারলুম না? কেন সব সময় এ-সব কথা আমার মনে ওঠে?

মা নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে মেয়ের চোখ-মুখ মুছিয়ে দিলে। বললে—আর কাঁদিসনি চুপ কর—

এতক্ষণে একটু যেন শান্ত হলো জয়ন্তী। বললে—মা, তোমরা আমার বিয়ে দিও না মা। মনে করে নাও না মা যে আমি তোমাদের ছেলে। ছেলে হলে তো সে চিরকাল তোমাদের কাছেই থাকতো। আমিও সেই রকম চিরকাল না-হয় তোমাদের কাছে থাকবো।

—কিন্তু তারপর?

জয়ন্তী জিজ্ঞেস করলে—তারপর মানে?

মা বললে—আমরা তো আর চিরকাল বেঁচে থাকবো না, তখন? তখন কী করবি?

জয়ন্তী বললে—আমিও তো চিরকাল থাকবো না মা। কেউই তো চিরকাল থাকে না সুতরাং ও কথা ছেড়ে দাও তুমি—

মা বললে—কিন্তু মানুষ তো চিরকাল বেঁচে থাকতেই চায় মা। মানুষের শরীরটা তো শ্মশানে গিয়ে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু মন? তার মন বলে সে বেঁচে থাকুক। তাই মন চায় তার ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনীর মধ্যে বেঁচে থাকতে। সেই জন্যেই মানুষ তার ছেলে-মেয়েদের অত ঘটা করে বিয়ে দিয়ে যায়—

শেষ পর্যন্ত জয়ন্তী যুক্তিটা বুঝলো কি বুঝলো না তা জানা গেল না। সে চুপ-চাপ খেয়ে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

তাই বলছিলাম শেষ পর্যন্ত সে এলো।

অথচ এককালে তো আমার বাবা-মা আত্মীয়স্বজন সবাই কত আশা করেছিল যে সে আসবে! আশা করেছিল যে সে আমাদের বাড়িতে এসে আমাদের সংসার আলো করে দেবে।

কিন্তু সেদিন মনে হলো যে সে যেন না এসে ভালোই করেছে। সে সেদিন আমাদের বাড়িতে এলে তো বুঝতেই পারতুম না কত অন্যায়, কত অনাচার, কত অত্যাচার আমরা সহ্য করে চলেছি। কত কালো-টাকা, কত ঘুষ, কত হিংসে, কত পাপ কত অবিশ্বাস আমাদের গ্রাস করে চলেছে। সে যদি না আসতো তাহলে এ-সব কিছুই জানতে পারতুম না ভাই। তুই লেখক, তাই তোকে বলতে এলুম ঘটনটা।

আর আশ্চর্য, আমার সঙ্গেই কিনা সেই জয়ন্তীর বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল। বিয়ের দিন-ক্ষণ পাকা হওয়ার পর নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপাও হয়ে গেল।

অথচ শেষ পর্যন্ত বিয়েটা যে হলো না সে এক অভাবনীয় কারণে। তুই তো তা সবই জানিস।

বসন্ত আমাকে সমস্ত কথাই বলেছিল!

কিন্তু তখন তো সুজয় জয়ন্তীর অতীতটা জানতো না।

জয়ন্তী যে সাধারণ মেয়ের মতো অল্পেতে তুষ্ট নয় তা কে কল্পনা করতে পারবে? অথচ সন্তোষবাবু তো চেয়েছিলেন যে তাঁর মেয়ে সাধারণ মেয়ের মতোই একদিন বিয়ে করে সংসার-ধর্ম করুক, সন্তান-সন্ততির মা হোক, আর পাঁচজন অন্য গৃহিণীর মতো সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে আজীবন স্বামী-সেবা করুক।

একমাত্র সেইটেই ছিল সন্তোষবাবুর মনোগত ইচ্ছে।

তাই যখন সুজয় চক্রবর্তীর মতো ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেল তখন তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন—এবার জয়ন্তী কী বলছে?

স্ত্রী বললে—কিছু তো বলছে না। জানি না কী ওর মনের ইচ্ছে—

সন্তোষবাবু বললেন—তুমি ওকে একবার জিজ্ঞেস করো না। দেখ

না ও কী বলে !

সন্তোষবাবুর কথা মতো একদিন একলা পেয়ে মা জিজ্ঞেস করলে—কী রে, তোর কী মত ? যারা দেখে গেল, তোকে তাদের পছন্দ হয়েছে।

জয়ন্তী জিজ্ঞেস করলে—ওরা কত টাকা নগদ নেবে ?

মা বললে—নগদ একটা পয়সাও নেবে না—

জয়ন্তী বললে—তাহলে গয়না ? কত ভরি সোনার গয়না দাবী করেছে ?

মা বললে—কোনও দাবী করেনি—

—তাহলে কি জড়োয়া গয়না চেয়েছে ?

—না, তাও চায়নি !

জয়ন্তী বলে উঠলো—তাহলে ? তাহলে এত দয়া কেন হঠাৎ ? কী মতলোব তাদের ? এ যুগে তো এমন দয়া কেউ করে না !

মা বললে—আরে, এযুগে সব লোকই কি তা বলে খারাপ হয়ে গিয়েছে ? ভালো লোক কি তা বলে একজনও নেই বলতে চাস ?

জয়ন্তী বললে—আমি তো দেখতে পাই না।

মা বললে—তুই বাড়ির মধ্যে থাকিস, পৃথিবীর কতটুকু আর জানতে পাস ?

জয়ন্তী বললে—তোমরা যেমন হাঁড়ির একটা ভাত টিপে বুঝতে পারো যে পুরো হাঁড়ির ভাত সেদ্ধ হয়েছে কিনা, তেমনি আমিও একটা দু'টো লোক দেখলেই বুঝতে পারি লোকগুলো কী চায় ?

মা বললে—ওমা, তুই আবার কবে কাকে দেখলি ?

জয়ন্তী বললে—কেন, আমি কি কলেজে যাই না ? আমি কি রাস্তা দিয়ে হাঁটি না ? আমি কি বাসে-ট্রামে চড়ি না ? আমি কি ক্লাশের মেয়েদের কাছ থেকে তাদের জীবনের গল্প শুনি না ?

—তাতে কী বুঝিস ?

জয়ন্তী বললে—সবাই একই কথা বলে।

মা বললে—কী একই-কথা বলে ?

জয়ন্তী বললে—তারা সবাই এখন বলে সেক্স-এর চেয়ে এখন টাকার দিকেই মানুষের ঝোঁকটা বেশি। সবাই টাকাকেই প্রয়োরিটি দেয় এখন—

মা ইংরিজি কথার মানে বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—তার মানেটা কী?

জয়ন্তী বললে—তার মানে হলো সকলের মনেই এখন আগে টাকা তার পরে সেক্স—

মা বললে—কিন্তু এখন যে জায়গায় তোর বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেছে এরা তো টাকা চাইছে না। নগদ টাকা তো চাইছেই না, এমন কি কতো ভরি সোনার বা জড়োয়া গয়না দিতে হবে তাও কিছু বলছে না।

জয়ন্তী বললে—তাহলে কেন আমার সঙ্গে তাদের ছলের বিয়ে দিতে বাজি হয়েছে?

—রাজি হয়েছে আমাদের বংশ-মর্যাদা আর তোর রূপ-গুণ দেখে।

জয়ন্তী বললে -পাত্রের কি কলকাতা শহুরে নিজস্ব বাড়ি আছে?

—না, ভাড়া বাড়িতে থাকে ওরা—

জয়ন্তী বললে—তাই বলো! শুধু শুধু আমাকে পছন্দ হয়নি! আমাদের বাড়িটা পাওয়ার আশাতেই আমাকে পছন্দ হয়েছে। জানো তো যে আমার কোনও ভাই নেই। তোমরা মারা গেলে তারা এই বাড়িটারই মালিক হয়ে যাবে। আমার রূপ-গুণ দেখে আমাকে পছন্দ হয়েছে, না ছাই ··আমি ও-সব খুব বুঝতে পারি—

মা বললে –কেন, এ-পর্যন্ত কেউ তোকে অপছন্দ করেছে?

—অপছন্দ করেনি স্বীকার করছি। এতদিনে প্রায় পনেরো-কুড়ি জায়গায় আমার সম্বন্ধ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তো ওই একটা জায়গাতেই বিয়ে আটকে গেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয় পাত্র চরিত্রহীন, মাতাল, পিল খায়, জুয়াড়ী, আর নয় তো পণ হিসেবে অনেক টাকা বা গয়না চেয়েছে। কিন্তু এই-ই প্রথম পণ ছাড়া বিয়ে করতে রাজি হয়েছে।

এখন ভেবে দেখছি এদের মনেও আমাদের এই বাড়ির ওপর লোভ রয়েছে—

মা মেয়ের কথা শুনে বললে—তোর যত সব বিদ্‌ঘুটে চিন্তা ··

জয়ন্তী জিজ্ঞেস করলে—এ পাত্রের নাম কী ?

মা বললে—সুজয় চক্রবর্তী—। লেখা-পড়া জানা। এম-এ পাশ। বেলেতে পাকা চাকরি। মাইনে পায় সব মিলিয়ে আটশো টাকার মতোন। তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়েও আরো ছ'তিন শো টাকা উপায় করে। দেশে বাপের জমি-জমা আছে। বাপের ওই একই ছেলে। বাপ এককালে ইস্কুলের হেডমাস্টার ছিল। মা-ও বেঁচে আছে। তোর অনেক ভাগ্য ভালো যে এমন লোক তোকে ছেলের বউ করতে পছন্দ করেছে। এরা নেমন্তন্নর চিঠিও ছেপে ফেলেছে। এখন যেন তুই আবার মাথা গরম করে বাগ্‌ড়া দিস্‌নি—

আর মা জয়ন্তীকে যা করতে বারণ করেছিল, জয়ন্তী তাই-ই করলে। জয়ন্তী সেই বাগড়াই দিলে শেষ পর্যন্ত।

সত্যিই তখন বিয়ের সব যোগাড়-যন্ত্র পাকা। আশুবাবু বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপিয়ে ফেলেছিলেন। তাতে পাত্র হিসেবে সুজয়ের আর পাত্রী হিসেবে জয়ন্তী মুখোপাধ্যায়ের নামও ছাপা হয়ে গিয়েছিল। শুধু চিঠিগুলো বিলি হওয়ার যা অপেক্ষা।

আর ঠিক সেই সময়েই বসন্তকে নিয়ে সুজয় একবারের মতো কেবল নামমাত্র পাত্রীকে দেখবার প্রস্তাব করে পাঠালে।

সন্তোষবাবু অফিসসুদ্ধ লোককে তখন জানিয়ে বসে আছেন যে আগামী বৈশাখ মাসের ১০ই তারিখে তার মেয়ে জয়ন্তীর শুভ-বিবাহ।

শিববাবু বললেন—খুব ভালো খবর শোনালে। এখন চিরকালের মতো নিশ্চিন্ত। পাত্র কী করে ?

সন্তোষবাবু বললেন—বেলে চাকরি করে।

—এখন মাইনে পায় কতো ?

—এই সব মিলিয়ে আটশো'র মতোন। আর ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে আরো ছ'তিনশো'র মতোন উপায় করে।

—লেখা-পড়া কত দূর ?

—এম-এ পাশ।

—দেনা-পাওনা ?

সন্তোষবাবু বললেন—এক পয়সাও দাবি নেই দাদা।

শিববাবু বললেন—বাঃ বাঃ, আপনি তো ভাগ্যবান মানুষ মশাই। বিনে পয়সায় মেয়ে পার করতে এ-যুগে কে পারে বলুন ? আপনার পায়ের ধুলো দিন মশাই—

সন্তোষবাবু বললেন—বিনা পয়সায় মেয়ে পার করছি কেন বলছেন ? আমার নিজের একমাত্র মেয়ে, তার বিয়েতে আমি যা খরচ করবো তা করবোই। তা পাত্রপক্ষ চাক আর না-চাক। মেয়ে যখন জন্মেছিল তখন থেকেই হিসেবের খরচের খাতায় লিখেই রেখে দিয়েছি—

খবরটা শুনেও আনন্দ, শুনিয়েও আনন্দ। তাই সন্তোষবাবু সামনে যাকে পেয়েছেন তাকেই শুনিয়েছেন।

কিন্তু সেই পাকা-ঘুঁটিই যে এমন ভাবে কেঁচে যাবে তা কে জানতো ?

বসন্তই গিয়েছিল সন্তোষবাবুর কাছে প্রস্তাবটা পেশ করতে।

প্রস্তাবটা শুনেই তো সন্তোষবাবুর মাথায় হাত।

বললেন—কেন, পাত্র আবার মেয়ে দেখবে কেন ? মেয়ে কি অপছন্দ হয়েছে ?

বসন্ত বললে—না না, ছি ছি, ও-কথা নয়। বিয়ে এখানে হবেই। এমন কি বিয়ের নেমন্তন্নর চিঠিও ছাপা হয়ে গিয়েছে। সে তো আপনি জানেনই—

সন্তোষবাবু বললেন—হ্যাঁ, আমিও তো আমাদের নেমন্তন্নর চিঠিও ছাপতে দিয়েছি—এখন আবার নতুন করে মেয়ে দেখবার প্রস্তাব ওঠে কেন ?

বসন্ত বললে - এটা একেবারে ফর্ম্যাল ব্যাপার। পাত্রের বাবা মা আমি সবাই-ই পাত্রীকে দেখে পছন্দ করেছি। শুধু পাত্রই বলছিল যে

আর একবার পাত্রীকে তার দেখতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য যদি আপনি অনুমতি দেন…

সন্তোষবাবু কী বলবেন বুঝতে না পেরে প্রথমে চুপ করে রইলেন। তারপর বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। বললেন—আমি একবার পাত্রীর মাকে কথাটা বলে আসি। আপনি বসুন একটু, আমি এখুনি আসছি—

সন্তোষবাবুর কথা শুনে স্ত্রী তো অবাক।

বললে—সে কী? হঠাৎ শেষ মুহূর্তে এ কী কথা? এ-রকম তো কথা ছিল না—

সন্তোষবাবু বললেন—আমিও তো তাই বললুম ওঁকে!

—কে? কে এসেছে ও-কথা বলতে?

সন্তোষবাবু বললে—পাত্রের এক বন্ধু। সে দেখেছে, পাত্রের বাবাও একবার দেখে গেছেন। এ বিয়ে হবেই। ওঁদের নেমন্তন্নর চিঠিও ছাপা হয়ে গেছে। শুধু চিঠি বিলি করতেই যা একটু অপেক্ষা। এখন পাত্রের নিজের নাকি একবার দেখবার খুব ইচ্ছে হয়েছে, তাই…

—এখন পাত্র যদি মেয়েকে দেখে নাকচ করে দেয়? তখন?

সন্তোষবাবু বললেন—না না, নাকচ করবার কথাই উঠছে না। শুধু একবার দেখতে চায় বিয়ের আগে, নিজের চোখে…

স্ত্রী বললে—কে কে মেয়ে দেখবে?

—শুধু পাত্র নিজে আর পাত্রের বন্ধু। আর কেউ নয়—

—কিন্তু জয়ন্তী কি রাজি হবে? শুনলে যদি আবার রেগে যায়? অনেক কষ্টে আমি ওকে রাজি করিয়েছিলুম।

সন্তোষবাবু বললেন—আর একবার চেষ্টা করে দেখ না যদি রাজি করাতে পারো এই শেষ বারের মতো। আর কখনও বলবে না কেউ—

মা গেল জয়ন্তীর কাছে। জয়ন্তী তখন নিজের এগ্‌জামিনেশনের পড়া নিয়ে খুব ব্যস্ত।

মা খুব ঠাণ্ডা গলায় প্রস্তাবটা দিতেই জয়ন্তী একেবারে ক্ষেপে দপ্‌ করে জ্বলে উঠলো।

বললে—কী? আমাকে পেয়েছো কী তোমরা? আমি কি বাজারের

পচা মাছ যে বার-বার কানকো দেখে পেট টিপে দর যাচাই করবে? আমি যাবো না ওদের সামনে!

মা বললে—ওরে আজ নয়, কাল রবিবার। ছুটির দিন বলে কাল আসতে চায়। পাত্র নিজে আসতে চায়। সেই সুযোগে তুইও না-হয় পাত্রকে একবার নিজের চোখে দেখে নিবি আর আমরাও তো পাত্রকে কেউ দেখিনি—আমরাও দেখবো পাত্রকে—

সাধে কি মেয়ে রাজি হয়!

তাই সেইটুকু ভরসা পেয়েই সন্তোষবাবু নিচে এসে বসন্তকে বললে—ঠিক আছে। আপনি পাত্রকে নিয়ে কাল সকাল দশটার মধ্যে আসুন, তখনই জয়ন্তীকে দেখে নেবে পাত্র—

বসন্ত কথা আদায় করে চলে গেল। রাস্তাটা কিছুটা এগিয়ে গিয়ে যেখানে বেঁকেছে সেখানে একটা সিনেমা হাউসের সামনে তখন উদগ্রীব আগ্রহ নিয়ে সুজয় অপেক্ষা করছিল। বসন্তকে দেখতে পেয়েই দৌড়ে সামনে এগিয়ে এল।

বললে—কী রে, রাজি হয়েছে?

বসন্ত বললে, হ্যাঁ, মেয়ের বাবা ভেতরে গিয়ে কাকে কী জিজ্ঞেস করে এলেন, তারপর বললেন কাল সকাল দশটার মধ্যে যেতে—

আর সেই যাওয়াই সুজয়ের পক্ষে কাল হলো।

সকলের জীবনেই প্রায় একটা না একটা সময় আসে যখন এমন একটা বিপর্যয় ঘটে যা সারা জীবন ধরে কখনও সে ভুলতে পারে না। সেই ভুলতে না-পারার ঘটনাটাই তাকে সারা জীবন পীড়া দেয়; সারা জীবন তার পিছু নেয়, সারা জীবন তাকে তাড়া করে বেড়ায়।

এমনি একটা ঘটনাই ঘটলো সুজয়ের জীবনে তার পরের দিন ঠিক সকাল দশটার সময়।

বসন্ত আর সুজয় সেই সময়েই গিয়ে হাজির হলো সন্তোষবাবুর বাড়িতে। সব ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রেখেছিলেন সন্তোষবাবু। সুতরাং আকস্মিকতার কোনও প্রশ্নই ওঠেনি—কোন পক্ষের মনে।

বসন্ত আর সুজয় প্রথমে ঘরে ঢুকেই নমস্কার বিনিময়ের পরে বললে

—আবার আপনাদের একটু কষ্ট দিলুম—

সন্তোষবাবু বললেন—না না, এতে কষ্ট কোথায় ? এ তো আমাদের পক্ষে পরম আনন্দের কথা, বাবাজীকেও এই প্রথম আমারা চোখের দেখা দেখতে পেলাম। নইলে তো আর আমাদের সে-সৌভাগ্যও হতো না—

এর পর জলযোগের বন্দোবস্তও ছিল এলাহি।

বসন্ত একবার ভদ্রতাসূচক আপত্তি প্রকাশ করে বললে—আবার এ-সব আয়োজন করতে গেলেন কেন মিছিমিছি। বিয়েটা তো পাকাপাকি হয়েই গেছে এক-রকম—

সন্তোষবাবু সবিনয়ে বললেন—তা তো জানিই, তবু আমাদের কুটুম্বিতের যা নিয়ম তা তো পালন করতেই হবে।

বলে আপ্যায়নের হাসিতে মুখমণ্ডল ভরিয়ে ফেললেন।

আগে থেকে সুজয় বসন্তকে সব কিছু শিখিয়ে-পড়িয়ে রিহার্সাল দিয়েই রেখেছিল যাতে বসন্ত ভুল না করে। কী কী প্রশ্ন পাত্রীকে কখন কখন করতে হবে, আর কী প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরে আবার কী কী প্রশ্ন করা উচিত হবে, সব কিছুই বসন্তকে সুজয় পাখী-পড়া করে মুখস্ত করিয়ে দিয়েছিল।

তারপর এক সময়ে জয়ন্তী সাজ-সজ্জা করে তার নির্দিষ্ট চেয়ারটাতে এসে বসে দুজনকে প্রণাম করলো।

বসন্তও প্রতি-নমস্কার করে ভদ্রতা বজায় রাখলো।

দু'পক্ষ থেকে মিনিটখানেক কোনও প্রশ্নোত্তর না-ওঠায় সন্তোষবাবুই প্রথম মুখ খুললেন।

বললেন—কই, কিছু প্রশ্ন-ট্রশ্ন করুন—

বসন্ত জিজ্ঞেস করলে—আপনার নাম কী ?

জয়ন্তী নিচু গলায় কিন্তু শান্ত গাম্ভীর্যের স্বরে বললে—কুমারী জয়ন্তী মুখোপাধ্যায়—

বসন্ত উত্তরটা শুনে যেন খুব খুশী হয়েছে, এইভাবে তার দ্বিতীয় প্রশ্ন করলে—আপনি এখন কী পড়ছেন ?

জয়ন্তী আগের বারের মতোই শান্ত স্বরে বললে—আমি আই-এ সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছি—

বসন্ত এবার বললে—ইংরেজী কবি এবং নাট্যকারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে বলে আপনার মনে হয় ?

জয়ন্তী টপ্ করে বলে উঠলো—শেক্‌স্‌পীয়র। যদিও সে সম্বন্ধে অনেক মত-বিরোধ আছে !

বসন্ত জিজ্ঞেস করলে—কেন, মত-বিরোধ কেন আছে ?

জয়ন্তী বললে—আর্টে মতবিরোধ থাকবেই। কারণ সেটা আর্ট। সায়েন্সে কোনওদিন কখনও মতবিরোধ থাকে না, কারণ সেটা সায়েন্স।

বসন্ত উত্তরটা শুনে যেন খুব খুশী হয়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, শেক্‌স্‌পীয়ারের কোন বই আপনাদের ক্লাসে পড়ানো হয় ?

জয়ন্তী উত্তর দিলে—জুলিয়াস সীজার—

বসন্ত এবার বললে—আপনি 'জুলিয়াস সীজার' থেকে যে-কোনও দু'তিনটে লাইন মুখস্থ বলতে পারবেন ?

জয়ন্তী বললে—হ্যাঁ—

বলুন তো, শুনি।

জয়ন্তী বলতে লাগলো—কোন সীন্‌টা থেকে বলবো ?

বসন্ত বললে—যে-কোনও জায়গা থেকে বলুন—

জয়ন্তী বলতে লাগলো—জুলিয়াস সীজারের এ্যাক্ট ফাইভ সীন ফাইভ—

বসন্ত বাধা দিতেই জয়ন্তী থেমে গেল। বসন্ত বললে—বাঃ, বেশ। এবার আর একটা প্রশ্ন করি, বলুন তো, বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি কে ?

জয়ন্তী বললে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

বসন্ত বললে—তাঁর যে-কোনও কবিতা থেকে দু'তিনটে লাইন মুখস্থ বলতে পারেন ?

জয়ন্তী বললে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সফলতা' নামে কবিতা থেকে বলছি ঃ

মাঝে মাঝে কতবার ভাবি কর্মহীন
আজ নষ্ট হলো বেলা, নষ্ট হলো দিন ॥
নষ্ট হয় নাই, প্রভু সে সকল ক্ষণ,
আপনি তাদের তুমি করেছ গ্রহণ
ওগো অন্তর্যামী দেব।...

বসন্ত বললে—থাক থাক, হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে—এবার আর একটা প্রশ্ন করি। আপনি সিনেমা দেখেন ?

জয়ন্তী বললে—হ্যাঁ দেখি।

—আপনার মতে কে সবচেয়ে বড় অভিনেত্রী ?

জয়ন্তী বললে—ক্যাথারীন হেপবার্ন।

—কে সবচেয়ে বড় অভিনেতা ?

জয়ন্তী বললে—অনেকের মতে ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্ক। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভালো লাগে রোল্যান্ড্ কোল্ম্যানকে—

সন্তোষবাবু একপাশে বসে প্রশ্নোত্তরগুলো শুনছিলেন আর মনে মনে খুব খুশী হচ্ছিলেন মেয়েব বিদ্যেবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে।

এবার বসন্ত জিজ্ঞেস করলে—আপনি গান শুনতে ভালোবাসেন ?

জয়ন্তী উত্তর দিলে—হ্যাঁ—

—ক্ল্যাসিক্যাল গান না আধুনিক ?

জয়ন্তী বললে—ক্ল্যাসিক্যাল।

—কখনও গান গাইতে চেষ্টা করেছেন ?

জয়ন্তী বললে—না—

—নাচ ? নাচ পছন্দ হয় ?

জয়ন্তী বললে—হ্যাঁ—

বসন্ত জিজ্ঞেস করলে—কখনও নাচ শিখতে ইচ্ছে হয়েছে ?

জয়ন্তী বললে—না—

বসন্ত জিজ্ঞেস করলে—নাচ শেখবার মাস্টার রাখলে আপনি তার কাছে নাচ শিখতে পারবেন ?

এতক্ষণ জয়ন্তী বসন্তর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল বেশ শান্তভাকে

মুখ নিচু করে। এবার সে মুখ তুললো। হঠাৎ কেউটে সাপের মতো ফণা তুলে বলে উঠলো—এতক্ষণ তো আপনার সব কথার উত্তর আমি দিলুম। কিন্তু এবার আপনি আমার একটা কথার উত্তর দিন। আপনার পাশে যিনি বসে আছেন, উনিই নিশ্চয় পাত্র।

সন্তোষবাবু মেয়ের এই আচরণে কেমন যেন হতচকিত হয়ে গেলেন। তাঁর মেয়ে হঠাৎ এত রেগে উঠলো কেন?

জয়ন্তীর মুখ দিয়ে তখন খই ফুটছে। সে বলে চলেছে—আমি ধরেই নিয়েছি যে উনিই পাত্র। তা উনি তো শুনেছি মাত্র আটশো টাকা মাইনে পান। যদি আমাকে গান শেখাবার জন্যে গানের ওস্তাদ আর নাচ শেখাবার জন্যে নাচের মাস্টার রাখেন, তাহলে মাসে মাসে তাদের যা মাইনে দিতে হবে তা তিনি দিতে পারবেন তো! আর আমি গান আর নাচ শিখতে গেলে বাড়িতে রান্নাবান্নার জন্যে নিশ্চয়ই লোক রাখতে হবে। তার মাইনে উনি দিতে পারবেন তো!

সমস্ত ঘরটাতে তখন কবরখানার নিস্তব্ধতা।

জয়ন্তী হঠাৎ সন্তোষবাবুর দিকে ফিরে বললে—বাবা, তুমি ওঁদের বলে দাও যে আমার ওখানে বিয়ে হবে না।

বলে হঠাৎ ঘর ছেড়ে ভেতরে চলে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে সকলের মাথার ওপরে যেন বাজ ভেঙে পড়লো।

তাই বলছিলাম ভাই, শেষ পর্যন্ত সে এলো।

অথচ একদিন আমার বাবা-মা-আত্মীয়-স্বজন কত আশা করেছিল যে সে এসে আমাদের সংসার আলো করে দেবে। সে আমাদের সংসারে এলে আমাদের বাড়ি স্বর্গ হয়ে উঠবে। কিন্তু সেদিন সে এলো না।

এখন ভাবি সে না এসেছে ভালোই করেছে। সেদিন সে এলে তো জানতেই পারতুম না যে কত পাপ, কত অন্যায়, কত অনাচার, কত অত্যাচার, কত অবিশ্বাস আমাদের জীবনকে গ্রাস করে ফেলেছে। কত ঘুষ, কত কালো টাকা, কত অবিচারের অভিশাপে আমরা জ্বলে মরছি····

সুজয়ের দিকে আমি অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—একই কথা বার-বার তুই এমনি করে বলছিস কেন? আমি যে কিছুই—

সুজয় বললে—তুই তো সবই জানিস। যেদিন আমার সেই বিয়েটা ভেঙে গেল, সেদিন আমাদের বাড়ির সকলের মনের অবস্থাটা ভাব দিকিনি একবার!

মনে আছে সেদিন রাত্তিরবেলা সুজয় আর বসন্ত দুজনেই আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল। আমি তখন খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়েই পড়েছি। হঠাৎ বসন্ত জানালা দিয়ে আমাকে চুপি চুপি ডাকতে লাগলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কে?

বসন্ত বললে—আমি বসন্ত রে। একবার বাইরে আয় তো তুই। খুব জরুরী ব্যাপার।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি বসন্ত একলা নয়, সঙ্গে সুজয়ও রয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম—কী রে, তোরা? এত রাত্তিরে? কী কবতে?

বসন্ত বললে—সুজয়ের বিয়ে ভেঙে গেছে রে!

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম—নেমন্তন্নব চিঠি যে ছাপা হয়ে গেছে যে! এখন কী হবে?

বসন্ত বললে—মেয়েটা খুব ধড়িবাজ রে! একেবারে এককথায় বিয়ে ভেঙে দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল, আর বাইবে এলো না।

—আর তোরা কী করলি?

বসন্ত বললে—আমরা আর কী করবো। চুপ-চাপ সেখানে আমরা দাঁড়িয়ে রইলুম।

—আর মেয়ের বাপ?

বসন্ত বললে—মেয়ের বাপ আর কী বলবে! মেয়ের বাপ মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। আর আমরা অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম। যখন প্রায় আধ-ঘণ্টা কেটে গেছে তখন সন্তোষবাবু এসে ক্ষমা চাইলেন। বললেন—তাঁর

মেয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে দিয়েছে। অনেকবার দরজায় ধাক্কা দিয়েও কোনও কাজ হলো না। সন্তোষবাবু হাতজোড় করে আমাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন। বললেন—আমার মেয়েকে আপনারা চেনেন না। যখন ও একবার বলেছে যে এখানে বিয়ে করবে না তো তখন আর ওর কথার নড়চড় হবে না—

—তাহলে কী হবে? আমাদের যে বিয়ের নেমন্তন্নর চিঠি ছাপান হয়ে গিয়েছে।

সন্তোষবাবু বললেন—আমিও তো তাই ভাবছি। আমিও তো বিয়ের চিঠি ছাপতে দিয়েছি—

—তাহলে কি এ বিয়ে ক্যানসেলড্ হলো বলে ধরে নেব আমরা?

সন্তোষবাবু বললেন—প্রায় তাই-ই বলতে পারেন। আমার মেয়ে বড়ো একগুঁয়ে। আমি অনেক করে বলার পর তবে এই প্রথম বিয়ে করতে একটু রাজি হয়েছিল। এর আগে পনেরো কুড়িবার কত লোক দেখে গেছে। একটা-না একটা কারণে সে বিয়ে ভেঙে দিয়েছিল। এই-ই প্রথমবার ও বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল। আপনারা কেন ওকে অতবার ধরে অত প্রশ্ন করতে গেলেন? ও তো রেগে যাবেই—

সুজয় বললে—কিন্তু আমাদের তো মানসম্ভ্রম বলে একটা জিনিস আছে। আমরা কি বিয়ের তারিখ একটু পিছিয়ে দেব? আবার নতুন করে চিঠি ছাপাব?

তখন সুজয়ের যেমন সমস্যা, সন্তোষবাবুরও তেমনি একই সমস্যা। এই সমস্যার কী যে সমাধান হবে তা কোনও পক্ষেরই মাথায় এলো না।

শেষকালে সন্তোষবাবু বললেন—মেয়ে পছন্দ যখন একবার ফাইন্যাল হয়ে গিয়েছিল তখন আবার আপনারা মেয়েকে ক্রশ এগ-জামিনেশন করতে এলেন কেন? বুঝতেই তো পাচ্ছেন আজকালকার মেয়েরা আগেকার আমলের মেয়েদের মতোন অত কনজারভেটিভ নয়…

এর পরে আর কী বলা যেতে পারে।

তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে বসন্ত আর একবার বললে—আর কোনও উপায় কি নেই ?

সন্তোষবাবু বললেন—আমি অবশ্য আর একবার চেষ্টা করবো মেয়েকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাবার জন্যে। কিন্তু আমাব মেয়েকে তো আমি চিনি। মনে হয় আমার মেয়ে এর পর আর কিছুতেই রাজি হবে না। তবু আপনারা কাল এই সময়ে আর একবার আসবেন, আমি দেখবো যদি ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাতে পারি—

মনে আছে সেই রাত্রেই আমরা সবাই মিলে গেলাম এক বন্ধুর বাড়ি।

আমার বন্ধুর বউ আসামের মেয়ে।

আমাদের ডাকাডাকিতে বন্ধুতো অবাক। তাবাও ব্রাহ্মণ। বন্ধুর নাম মোহন ভট্টাচার্য। সে যাকে বিয়ে করেছিল তারা চট্টোপাধ্যায়।

বললাম—বউদিব এক দূর সম্পর্কের বোন ছিল না ?

মোহন বললে—হ্যাঁ তা তো ছিল, কিন্তু তাতে কী হবে ?

বললাম—তার সঙ্গে এই সুজয়েব বিয়ে হয় না ?

মোহন প্রস্তাবটা শুনে খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বললে—তাকে এখন কোথায় পাবো ? তারা তো গৌহাটিতে থাকে—

গৌহাটিই হোক আর দিল্লী মাদ্রাজ কি বোম্বাই-ই হোক, পয়সা খরচ করতে পার.ল দূরত্বটা কোনও সমস্যাই নয় এ-যুগে। প্রশ্নটা হলো ইজ্জতের। সুজয়ের বাবা মা সকলেরই ইজ্জতের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তার বিয়েটা। অনেক আত্মীয়স্বজনকে ব্যক্তিগতভাবে জানানোও হয়ে গেছে খবরটা। তারা যদি শোনে যে সুজয়ের বিয়েটা স্থগিত হয়ে গেছে, তাহলে প্রশ্ন উঠবে কেন স্থগিত হয়েছে ? কী কারণে স্থগিত হয়েছে ! কারা স্থগিত করেছে—বরপক্ষ না কন্যাপক্ষ ?

মোহন তার স্ত্রীকে ঘুম ভাঙিয়ে ওঠালো। বৌদিকেও সবকথা বিস্তারিতভাবে জানানো হলো।

বউদি শুনে খুবই খুশী। তার বোন সুজয়ের মতো বর পাবে এ

তো হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো ব্যাপার।

আর সুজয় ?

সুজয়ের সেই জোড়া ভুরু, দুধে আলতা গায়ের রং, পটোল-চেরা চোখ, সে-সব বায়নাক্কা আর নেই। যেমন-তেমন ঘরের একটি অবিবাহিতা বামুনের মেয়ে হলেই হলো। মার্লেন ডিয়াট্রেচ, লিলিয়ান গিশ, মেরিলিন মানরো, মেরী পিকফোর্ড—ওসব তখন বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কঠোর রুঢ় বাস্তবের সঙ্গে তখন একেবারে মুখোমুখি সংঘর্ষ। তখন শুধু বাঁচার প্রশ্ন, ইজ্জতের প্রশ্ন, প্রয়োজনের প্রশ্ন। এতদিন যে-জগতে সুজয় বাস করে এসেছে সেটা তখন, রুদ্ধদ্বার। এখন অন্য জগতে তাকে ফিরে আসতে হবে।

তার পরদিনই মোহন তার স্ত্রীকে নিয়ে গৌহাটি চলে গেল তার শ্বশুর বাড়িতে। আর তিন দিন পরেই সঙ্গে করে নিয়ে এলো তার শ্যালিকাকে। এতদিন অনেক চেষ্টা করেও যার বিয়ে হয়নি তারই সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল সুজয়ের। এর নামই তো হাতে চাঁদ পাওয়া।

বিয়ের দিন আমরা বউকে স্বচক্ষে দেখলাম।

শুধু আমরাই নয়, আরো অনেকেই দেখলে। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কারোরই দেখতে বাকি রইল না। একদিন ম্যাট্রিক পাশ না-করার অপরাধে একটা রূপসী পাত্রীকে সুজয় বাতিল করে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এখন এমন একজন পাত্রীকে বিয়ে করতে হলো যে জীবনে কোনও দিন স্কুলের মুখই দেখেনি।

কথায় আছে যে গরজ বড় বালাই। আমাদের সুজয়েরও তাই-ই হলো। শেষ পর্যন্ত সেই তাকে নিয়েই সুজয়কে ঘর-সংসার করতে হলো।

এ বড় কঠিন জগৎ। সংসারে অনেকে অনেক কিছুই চায়, কিন্তু পাওয়া ? পাওয়াটা বড় বাস্তব সত্য। অনেক মানুষ টাকাই চায়। সে ভাবে টাকা চাইলে সব পাওয়া তার মুঠোর মধ্যে এসে যাবে! কিন্তু তা কি সম্ভব! টাকা দিয়ে বিছানা কিনতে পাওয়া যাবে, কিন্তু ঘুম ? ঘুম কি টাকা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায় ? টাকা দিয়ে ওষুধ কিনতে

পাওয়া যাবে, কিন্তু স্বাস্থ্য ? স্বাস্থ্য কি টাকা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায় ? টাকা দিয়ে স্নো ক্রীম পাউডার কিনতে পাওয়া যাবে, কিন্তু সৌন্দর্য ? সৌন্দর্য কি টাকা দিয়ে কিনতে পাওয়া যাবে ?

তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। ভূগোলের মানচিত্রের রং যেমন বদলায় তেমনি শহরের মানচিত্রও বদলায়। এই কলকাতা কি আগে এমন ছিল ? ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের আগে কলকাতা যা ছিল এখন কি তাই আছে ? যেখানে যত বন-জঙ্গল-পুকুর-পোড়ো জমি ছিল তা কি এখন আছে ? তখনকার আমি আর এখনকার আমিই কি এক ? তখনকার সুজয় আর এখনকার সুজয়ই কি এক ? তখনকার বসন্ত আর এখনকার বসন্তই কি এক ? যে-মেয়ে আজকে মার কোলে মেয়ে হয়ে এলো কাল আবার সে নিজেই মা হয়ে যাবে। তারও একদিন আবার মৃত্যু হবে। মৃত্যুর পরে সে আবার তার ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনীর মধ্যেই বেঁচে থাকবে। এই নিয়ম মেনেই তো সংসার চলছে, এই নিয়ম মেনেই তো সংসার চলবেই। অনাদি অনন্তকাল ধরে সংসার এমনি করেই চলে এসেছে, আর অনাদি অনন্তকাল ধরেই সংসাব এমন করেই চলবে !

তাই-ই যদি হয় তাহলে আমরা অবাক হই কেন ? একজন মানুষ যখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে অন্য সকলকে ছোট মনে করে, আবার আর একজন মানুষ যখন দুঃখে কাতর হয়ে নিজেকে অভিশপ্ত জীব বলে মনে করে, তখন আমরা অবাক হই কেন ?

ভাগ্যিস পৃথিবীতে শোক ছিল, দুঃখ ছিল, মৃত্যু ছিল ! তা না থাকলে মানুষের কী সর্বনাশ হতো ! অহঙ্কারের যদি পতন না হতো, ঐশ্বর্য্যের উন্মত্ততার মধ্যে যদি ক্লান্তি না থাকতো তাহলে সংসার তো নরক হয়ে উঠতো। 'স্থিতিহীন গতি আর লাভহীন চেষ্টাই যদি মানুষের ভাগ্য হয় তাহলে এমন ভয়ানক দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে।' এ-কথা ঋষি রবীন্দ্রনাথই তো বলে গিয়েছেন।

তাই বোধহয় সে জয়ন্তী মুখার্জি আর সুজয় চক্রবর্তীর মধ্যেও অমন বিপরীতমুখী পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম।

প্রথমে সুজয় চক্রবর্তীর কথা বলি, তারপরে বলবো জয়ন্তী মুখার্জির কথা। দুজনেই এমনি ভাবে বদলে গিয়েছিল।

সুজয় তখন চাকরিতে অনেক প্রমোশন পেয়েছে। ভেবেছিলাম সুজয় বোধহয় সেই আগেকার মতোনই আছে। সেই দামী টুথ-পেষ্ট, সেই দামী সাবান আর সেই দামী স্নো-ক্রীম পাউডার নিয়েই মেতে আছে। ঘরের দেওয়ালে সেই মেরী পিকফোর্ড, মার্লিন ডিয়াট্রিচ, মেরিলীন্ মান্‌রোর ছবি টাঙিয়ে রেখেই সুজয় তার জীবনের চরম চরিতার্থতার সন্ধান করছে।

কিন্তু না, দেখলাম ঠিক তার উল্টোটা।

এ-ঘটনা বহুদিন পরের। তখন সে সপরিবারে থাকে জব্বলপুরে।

চিঠিতে অনেকবার সুজয় আমাকে তার জব্বলপুরের বাড়িতে যেতে অনুরোধ করেছিল। আমিও কথা দিয়েছিলাম যে ওদিকে গেলে তার বাড়িতে গিয়ে নিশ্চয় একবার তার সঙ্গে দেখা করবো।

তা সহজে কি মানুষ নড়তে চায়? বিশেষ করে কলম-পেষা যার পেশা। তার কেবল মনে হয় চব্বিশ ঘণ্টায় দিন না হয়ে আটচল্লিশ ঘণ্টায় তার দিন হলো না কেন? তাহলে আরো কিছু বেশি সময় সে জীবন নিয়ে নাড়ানাড়ি ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারতো।

কিন্তু সেবার বোম্বাই থেকে ফেরবার পথে মনে হলো জব্বলপুর স্টেশনটা যখন রাস্তায় পড়ে—সেখানে নেমে তার সঙ্গে দেখা করে যাই না কেন?

জব্বলপুর স্টেশনে নেমে নেপিয়ার টাউনে তার বাড়ি খুঁজে নিতে অসুবিধে হলো না। তারপর যখন তার বাড়ি পৌঁছিয়ে নিজের পরিচয় দিলাম তখন সুজয়ের গৃহিণী ইন্দুদেবী এলেন।

ইন্দুদেবীকে দেখে সেই বহুবছর আগেকার সুজয়ের বিয়ের ঘটনার কথাও মনে পড়ে গেল। কী বিপর্যয়কর সে-বিয়ের ঘটনা। সেই ঘটনার পর এই প্রথম দেখা এত বছর পরে।

নিজের পরিচয় দেওয়ার পর তবে ইন্দুদেবী আমাকে চিনতে পারলেন।

জিজ্ঞেস করলাম—সুজয় কোথায় ?

ইন্দুদেবী বললেন—তাঁর কি কোনও পাত্তা আছে ? সারা দিন তো কেবল চাকরি নিয়েই থাকেন—

জিজ্ঞেস করলাম—কী এমন চাকরি যে তার পাত্তাই পাওয়া যায় না ?

ইন্দুদেবী বললেন—চোর ধরার চাকরি—

চোর ধরার চাকরির কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

ইন্দুদেবী বললেন—সেই আগেকার চাকরি থেকে ডেপুটেশানে এই চাকরিই এখন করেন আপনার বন্ধু! মাসেব মধ্যে পঁচিশ ছাব্বিশ দিন বাইরে বাইরেই কাটে!

—তা হলে সংসার ? সংসার কে দেখে ?

ইন্দুদেবী হাসলেন। বললেন—কে আর দেখবে ? দেখবার জন্যে আমি আছি।

—আর সুজয়ের বাবা মা ?

ইন্দুদেবী বললেন -তাঁরা তো অনেক কাল আগেই মারা গেছেন! আপনি খবর পাননি ?

তখন মনে পড়লো সে-কথা। বহুদিন আগে সুজয়ের চিঠিতে সে-কথা জানতে পেরেছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে ভুগোলে এত সব বড় বড় ঘটনা ঘটে গেছে যে এই সুজয়ের বাবা-মা আমার বাবা-মা বা জয়ন্তীর বাবা-মা'র মারা যাওয়ার মতো তুচ্ছ ঘটনাগুলো আমাদের মনে না-থাকারই কথা। ইণ্ডিয়া স্বাধীন হয়ে গেছে, পাকিস্তান নামক একটা নতুন দেশের জন্ম হয়েছে। আর মাঝখান থেকে পৃথিবীর সমস্ত দেশকে টপ্‌কে আমেরিকা আর সোভিয়েট রাশিয়া সকলের মাথার ওপরে উঠে বসেছে। সমস্ত সাউথ-ইস্ট আর সাউথ ওয়েষ্ট এশিয়ার মানচিত্রটাই নতুন করে আঁকতে হয়েছে আবার। এই পটভূমিকায় আমাদের মত ক্ষুদ্র তুচ্ছ মানুষদের মানচিত্র নতুন করে আঁকতে হয়েছে। দুশ্চিন্তার যন্ত্রণা এমন পরিমাণে বেড়ে গেছে যে সমস্ত রকম ব্যক্তিগত দুঃখ-রোগ-শোক-মৃত্যুর ঘটনাগুলো ভুলিয়ে দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট।

মনে আছে সুজয়ের ঘরের ভেতরের সাজ-সজ্জা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কোথায় গেল সেই মেরী পিকফোর্ড, মার্লিন ডিয়াট্রিচ, লিলিয়ান গিশদের ছবি? তার জায়গায় রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সুভাষ বোস, রবীন্দ্রনাথের ফ্রেমে বাঁধানো ছবি টাঙানো। দরজা-জানালায় খদ্দরের রঙিন পর্দা। টেবিলে খদ্দেরের টেবিল-ক্লথ। সোফা-সেটেও সেই খদ্দরের ঢাকনি।

সুজয়ের এই মানসিক পরিবর্তন যে একদিন আমাকেই বেঁচে থেকে দেখতে হবে তা আমার কল্পনাতেও কখনও আসেনি।

তুটো দিন কোনও রকমে কাটিয়ে চলে আসবো ভাবছিলাম, এমন সময়ে সুজয় এসে হাজির হলো। আমাকে দেখেই লাফিয়ে উঠেছে। বললে—তুই নাকি চলে যাচ্ছিলি?

বললাম—চোর ধরতে তুই এত ব্যস্ত যে বাড়ির দিকেও নাকি একবার নজর দেবার সময় পাস না?

সুজয় হাসতে লাগলো।

বললে—আমার গিন্নী বলেছে বুঝি? না রে, এ এক অদ্ভুত চাকরি আমার। কোনও কাজ থাকুক আর না-থাকুক আমাকে সারা ইণ্ডিয়া চোরের খোঁজে চষে বেড়াতে হয়।

বললাম—এত চোর আছে আমাদের দেশে?

সুজয় বললে—চোর কোন্ দেশে নেই? যে-দেশ যত বড়লোক সেদেশে তত চোর—

—তোর কাজটা কী?

সুজয় বললে—আমার সব খবর দেওয়ার জন্যে লোক আছে। তাদের বলে 'ইন্‌ফরমার'। সেই 'ইন্‌ফরমার'রাই আমাকে প্রথমে চোরের খবর দেয়। তারপর আমি খোঁজ নিয়ে দেখি খবরটা সত্যি না মিথ্যে।

—তারপর?

সুজয় বললে—তারপর যদি অনেকবার যাচাই করেও দেখতে পাই যে খবরটা সত্যি তাহলে কোর্টে গিয়ে একজন ফার্স্ট-ক্লাশ ম্যাজিস্ট্রেটকে

আমার সঙ্গে যেতে লিখিত দরখাস্ত দিই। যেদিন যে-সময়ে আমি আসামীকে ধরবো সেদিন তাঁকে নিয়ে আমি ট্র্যাপ্ করবার আধঘণ্টা আগে এমন একটা জায়গায় লুকিয়ে থাকি, যেখান থেকে সেই ফাষ্ট ক্লাশ ম্যাজিস্ট্রেট সব শুনতে এবং দেখতে পায়। তারপর যে-লোকটা ঘুষ নেবে তার কথা বলার পর যেই টাকাগুলো সে নেবে, সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট বাইরে বেরিয়ে এসে টাকাশুদ্ধ হাতটা খপ্ করে ধরে ফেলবে—

—তারপর ?

সুজয় বললে—তারপর আর কী? তখন আমার ডিউটি শেষ। তখন মামলা শুরু হবে···

আমি তার কাছে গিয়েছি বলে সুজয় সেদিন আর কোথাও বেরোল না। বললে—আজকে আমার কোনও বিশেষ কাজ নেই, আজ আমি তোর সঙ্গেই কাটাব।

কথায়-কথায় বললাম—লক্ষ্য করছি, এখন তুই খুব বদলে গেছিস, আগেকার মতো আর নেই তুই—

—কেন? ও-কথা বলছিস কেন ?

বললাম—তোর দেওয়ালে সেই বিলিতি এ্যাক্‌ট্রেসদের ছবিগুলো সব কোথায় গেল ?

সুজয় বললে—সে-সব উনুনের আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছি—

—কেন রে ?

সুজয় বললে—তখন কতো আনাড়ী ছিলুম, তাই ভাবি। তখন সিনেমা দেখে কত মূল্যবান সময় আর পয়সা নষ্ট করেছি, এখন তো তা ভাবলে হাসি পায় ভাই।

বললাম—শুধু কি সিনেমা? সাবান টুথ্-পেষ্ট জামা-কাপড়-প্যাণ্ট, নিয়ে, তুই কতো রিসার্চ করতিস তা এখনও আমার মনে আছে—

সুজয় আমার কথা শুনে হাসতে লাগলো। বোধহয় লজ্জায় পড়লো। বললে—সে-সব কথা ভাবলেই এখন আমারও হাসি পায়!

জিজ্ঞেস করলাম—তা হঠাৎ তোর এত পরিবর্তন হলো কেন ?

সুজয় বললে—সে এক লম্বা কাণ্ড ভাই। আমার একটা মাত্র মেয়ে তা তো তুই জানিস। আদর করে তার নাম দিয়েছিলাম 'বুলা'। আসল নাম 'মিথিলা'। কেন ও-নাম দিয়েছিলুম জানি না, ইন্দুর বড়ো ইচ্ছে ছিল ওর মেয়ে হোক, ছেলে নয়।

বললাম—এও তো এক বড় আশ্চর্য জিনিস। সব মা বাবা তো ছেলেই চায়, তা ইন্দুদেবী ছেলে না চেয়ে মেয়েই বা চেয়েছিলেন কেন ?

ইন্দুদেবী এই কথা-বার্তার সময় হাজির ছিলেন। তিনি বললেন—আমি মেয়ে হয়ে জন্মাবার পর মা নাকি কেঁদে ফেলেছিল শুনেছি। তাই আমার বরাবর একটা স্বপ্ন ছিল যে ছেলের মা না-হয়ে মেয়ের মা হবো আমি। আর সেই মেয়েকে আমার মনের মতো করে মানুষ করে আমি প্রমাণ করে দেব যে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানো কোনও পাপ বা অপরাধ নয়, মেয়েরাও মানুষ আর তারাও সমাজের মানুষের অনেক উপকারে লাগে—

সুজয় বললে—হ্যাঁ ভাই, ইন্দু ঠিকই বলেছে। আমি ছোটবেলা থেকে জোড়া-ভুরু, দুধে-আল্‌তা গায়ের রং অন্ততঃ কম পক্ষে ম্যাট্রিক পাশ, এই সব নিয়ে কতো যে ছেলেমানুষী করেছি তার ঠিক নেই। সে-সব ভাবলেও এখন লজ্জা পাই। জোড়া-ভুরু দুধে-আলতা গায়ের রং, বা লেখাপড়া জানা হলেই যে কেবল মেয়েরা মানুষ হয়, আর অন্য মেয়েরা মানুষ নয়, এ ধারণা আমার বদলে গেছে। কিন্তু এ ধারণাটা বদলালো বুলার জন্মের পর—

আমি তার কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—কী রকম ?

সুজয় বললে—হ্যাঁ ভাই বুলার জন্ম হওয়ার পর দেখলাম তার গায়ের রং কালো, বেঁটে, জোড়া ভুরু নয়, দুইঞ্চি ফাঁকা চোখের ভুরু ! বুলাকে দেখে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল ভাই। তার ওপর তার ওজন মাত্র পাঁচ পাউণ্ড। ভাবলাম এই বাজারে ভবিষ্যতে এ মেয়ের বিয়ে দেব কী করে ? ভেবে ভেবে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল, চাকরির

কাজে মন বসলো না। বুলা আস্তে আস্তে যত বড় হতে লাগলো ভাবতাম এ-মেয়ের বিয়ে দেব আমি কী করে ? আমার কাজেও আর আগেকার মতো মন দিতে পারলাম না। তখন মনে পড়তে লাগলো সেই সব আগেকার ঘটনা। কত সুন্দরী মেয়ের বাবা-মা'কে আমি কত কষ্ট দিয়েছি এককালে। ম্যাট্রিক ফেল বলে বিয়েতে মত দিইনি বলে কত প্রকৃত সুন্দরী মেয়েদের মনে আঘাত দিয়েছি। সে-আঘাত ফিরে এসে তখন আবার আমাকেই আঘাত করতে লাগলো। তখন ভাবলাম এতদিন কত ভুলই করেছি। এর জন্যে তো দায়ী আমিই। আমার আদর্শটাই ছিল ভুল আদর্শ। তখন আমি দেওয়ালের সব গুলো ছবি ভেঙে ফেলে ওই নতুন ছবিগুলো কিনে আনলাম, তারপর ওই রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সুভাষ বোস, রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলো টাঙিয়ে দিলাম ওই জায়গাগুলোতে। ভাবলাম ভুল তো মানুষেই করে, আমিও ভুল করেছি।

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর ? তারপর কী হলো ?

সুজয় বললে—তারপর বুলা যত বড় হতে লাগলো আমার দুশ্চিন্তার যন্ত্রণা তত বাড়তে লাগলো। ভাবতে লাগলাম এ মেয়ে যখন বড় হবে তখন এ মেয়েকে নিয়ে আমি কী করবো ? তার তো একদিন বিয়ের বয়েস হবে, তখন কে তাকে পছন্দ করবে, কে তাকে বিয়ে করবে ? সবাই তো মেয়ের দুধে-আলতায় ফর্সা গায়ের রং ওয়ালা মেয়ে চাইবে, সবাই তো মেয়ের জোড়া-ভুরু চাইবে সবাই তো মেয়ের স্বপ্নালু চোখ চাইবে, সবাই তো আমার মতো লেখাপড়া পাশ করা মেয়ে চাইবে ! মেয়ে দেখতে খারাপ হলেও তাকে তো লেখা-পড়াটা অন্তত শেখাতে হবে। আমি না-হয় মেয়েকে লেখা-পড়া শেখাবার খরচটা দেব, কিন্তু যদি লেখা-পড়াটা তার না হয় ? তখন কী হবে ?

সুজয় একমনেই নিজের দুঃখের কথাগুলো বলে যাচ্ছিল, আর তার স্ত্রী আর আমি সে-সব কথা শুনে যাচ্ছিলাম। সে বলে যাচ্ছিল আর আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল সেই বহুকাল আগেকার সেই ঘটনাগুলো। এতদিন পরে যে তার জ্ঞান হয়েছে এইটে ভেবেই ভালো লাগছিল।

বললাম—কিন্তু কালো মেয়েদের কি তা বলে বিয়ে হচ্ছে না ?

সুজয় বললে—শুধু কালো মেয়ে হলে কিছু ভাবতুম না, কিন্তু আমার বুলার যে ফিগারটাও খারাপ—

আমি বললাম—মেয়ের বাইরের চেহারার খুঁতগুলো তো অনেক টাকা দিয়ে পুষিয়েও দেওয়া যায়। এমন পাত্র অনেক আছে যাদের ব্রিলিয়ান্ট কেরীয়ার, কিন্তু টাকার অভাবে হায়ার-এডুকেশন হচ্ছে না, সেই সব পাত্রেরা তো টাকার বদলে একটু নিরেশ মেয়েদেরও বিয়ে করতে রাজি হয়ে যায়। এমন ঘটনা আমি আকছার দেখেছি—

সুজয় বললে—না ভাই, আমি সেরকম কোনও রিস্ক নিইনি। এক অদ্ভুত উপায়ে এ ব্যাপারে একটা হিল্লে হয়ে গিয়েছে—

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কী রকম ?

সুজয় ’র পর যে কাহিনী শোনালে তাতে আমি আরো হতবাক হয়ে গেলাম।

একসঙ্গে সুজয় বেশিক্ষণ কথা বলবার সময়ই পেলে না সেদিন। অনেক কাজ তার চারিদিকে। সবেমাত্র ক'দিন পরে সে বাড়ি ফিরেছে। হঠাৎ-হঠাৎ টেলিফোন কল্ আসে অফিস থেকে। কথা বলতে বলতে উঠে গিয়ে টেলিফোন রিসিভারটা তুলে দু'চারটে কথা বলতে হয়। আবার রিসিভারটা রেখে আমার কাছে এসে কাহিনীটা বলে। সুজয় বললে—এই চাকরিটা না করলে বুঝতেই পারতুম না দেশে এত চোর।

বললাম—খবরের কাগজ পড়ে তো কিছু-কিছু টের পাই—

সুজয় বললে—খবরের কাগজে আর ক'টা খবরই বা বেরোয়।

আসল খবরগুলো তো কাউকে জানানোই হয় না, পাছে অন্য চোররা সাবধান হয়ে যায়!

হ্যাঁ, সত্যিই তো। যখনই খবরের কাগজের পাতায় ধর-পাকড়ের খবর ছাপা হবে তখনই সবাই ভয়ে একটু সাবধানে ঘুষ নেয়। সুজয়ের কাছে শুনেছি যে ঘুষের ব্যাপারে নাকি কোনও জাতি-ভেদ নেই, পাত্র-পাত্রী ভেদ নেই, দেশ-ভেদ ধর্মভেদ নেই।

রেল-ইনকাম-ট্যাক্স-পারমিট-লাইসেন্স ছাড়া পদ্মশ্রী পদ্মভূষণের ব্যাপারেও নাকি ঘুষের রেওয়াজ আছে।

এও এক আজব তুনিয়া।

তোমার মাল তুমি শালিমারে পাঠাবে। যে-মাল তুমি রায়পুরের বাজারে তুশো টাকায় কিনতে পাবে সেটা একবার যদি রেলের ওয়াগন পেয়ে শালিমার পাঠাতে পারো তো তুমি তা দেড়-হাজার টাকায় বিক্রি করতে পারবে। নীট ন'শো টাকা তোমার প্রফিট থাকবে। তা থেকে পাঁচশো টাকা রেলওয়ের সাহেবকে ঘুষ দিতে তোমার বাধা

আলোচনা মাঝ-পথেই থামিয়ে দেয় সুজয়। বলে—তুই আজকে থাক, আমি একদিনের জন্য একটু ঘুরে আসি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—আবার কোথায় যাবি তুই ?

সুজয় বললে—নাগপুর। নাগপুর যেতে এখান থেকে বড় জোর এক ঘণ্টা লাগে। তারপর ওখানে রাতটা কাটিয়ে কাল সকাল দশটার মধ্যেই আবার ফিরে আসবো আমি জব্বলপুরে—

বলে সুজয় চলে গেল।

ইণ্ডিয়াতে কালো টাকার যে কী রহস্যজনক লীলা চলছে তা নাগপুরে গিয়েই জানা গেল। খবরটা দিয়ে গিয়েছিল সুজয়েরই একজন ইনফরমার। জব্বলপুর মধ্যপ্রদেশের একটা বড় শহর। কিন্তু নাগপুর শহরটা মহারাষ্ট্রের মধ্যে পড়ে। সমস্ত ইণ্ডিয়ার যত কোম্পানি আছে, তার বেশির ভাগের হেড-অফিস বোম্বাই। দিল্লী নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রই হলো মহারাষ্ট্র। ইণ্ডিয়ার সব রাজ্যের টাকা এসে পাহাড় হয় মহারাষ্ট্রে এসে। তাই মধ্যপ্রদেশের শহর জব্বলপুর নাগপুরের বাড়-বাড়ন্ত বেশি।

আগে নাগপুর ছিল সেনট্রাল-প্রভিন্স-এর মধ্যে। তখন নাগপুরের রাস্তা-ঘাট-ড্রেনেজ—সবই ছিল অস্বাস্থ্যকর। মহারাষ্ট্রের মধ্যে আসার পর মহারাষ্ট্র বিধান-সভার শীতকালীন অধিবেশন বসে নাগপুরে। মহারাষ্ট্রে তো শীত পড়ে না। নাগপুর শীতকালে মহারাষ্ট্রের চেয়ে ঠাণ্ডা থাকে। তাই শীতের সময় এম-এল-এ'রা এখানে এসে একটু

আরাম করে। আর সেই সুবাদে নাগপুর শহর ক্রমেই জম-জমাট হয়ে উঠছে। বাড়ি উঠছে, প্রসাদের মতন বাড়ি দেখলে মানুষ চমকে ওঠে। আগেকার আমলের সেই মাছি-মশা আর নেই, সেই নর্দমায় পচা ময়লা নেই। গ্রীষ্মকালে গরম পড়ে বটে, কিন্তু শীতকালটা আরামের।

সেইখানেই গজিয়ে উঠেছে নতুন নতুন স্কুল কলেজ, হাসপাতাল, নার্সিং-হোম আর তারই কাছে গজিয়ে উঠেছে একটা বিশাল স্কুল-বাড়ি স্কুল-বাড়ি বটে, কিন্তু সাধারণ স্কুল-বাড়ি বললে যা বোঝায় তা নয়।

এই স্কুল-বাড়ির নাম দেওয়া হয়েছে—যোগ-বিবেক ভারতী।

এ ইণ্ডিয়াতে এক অদ্ভুত ধরনের সংস্থা। এ-ধরনের সংস্থা পৃথিবীতে আগে আর কখনও কোথাও প্রতিষ্ঠা হয়নি। এখানে এক নতুন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। এখানে শুধু মেয়েদেরই ভর্তি করে নেওয়া হয়। এখানে গরীবদের মেয়েদের শিক্ষার জন্যে কোনও টাকা লাগে না।

কিন্তু যারা অর্থবান? অর্থবানদের কাছ থেকে মাসে প্রায় পাঁচশো টাকা করে নেওয়া হয়। এখানে যে শুধু লেখা পড়া শেখানো হয় তাই-ই নয়। এখানে যোগ-বিদ্যাও শেখানো হয়। তার সঙ্গে আছে লেখা-পড়া। সাধারণ লেখা-পড়ার সঙ্গে অন্য আর এক রকম শিক্ষাও দেওয়া হয় যাকে বলা হয় নৈতিক শিক্ষা। কারোর ওপরে হিংসা করা অন্যায়, কারোর সঙ্গে বিবাদ করা পাপ। শিবজ্ঞানে জীব সেবাও শেখানো হয় মেয়েদের। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকার উপকারিতা আর পরিবেশ পরিচ্ছন্নতাও এখানকার শিক্ষার একটা অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ।

আর একটা অদ্ভুত নতুন ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয় এখানে। সেটা এখানে বিশদ করে বুঝিয়ে বলা দরকার।

সব মেয়ে সুন্দরী বা রূপসী হয়ে জন্মায় না। এমন হতভাগ্য অনেক বাবা-মা আছেন যাদের মেয়ে কুশ্রী বা কুরূপা। তাদের বিয়ের সময়ে বাবা-মাদের অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হতে হয়। লক্ষ লক্ষ টাকার

খেসারৎ দিয়ে তাদের কুরূপা বা কুশ্রী মেয়েদের পাত্রস্থ করতে হয়। যাদের সে আর্থিক সামর্থ্য থাকে না তাদের কী হবে? তাদের মেয়েদের কি আজীবন অবিবাহিতা থেকে যেতে হবে?

এ-সমস্যা নিয়ে ইণ্ডিয়ায় আগে কেউ কখনও ভাবেনি।

এই ব্যাপারে প্রথম ভেবেছেন এই নাগপুরের 'যোগবিবেক ভারতী'

এরা যেমন গরীব কন্যাদের বাবা-মায়েদের কথা ভেবে তাদের জন্যে শিক্ষার কথা ভেবেছেন, তাদের শিক্ষিত করে তুলে তাদের স্বনির্ভর করে তোলাবার ব্রত নিয়েছেন, তেমনি আবার বয়স্কা কুশ্রী বা কুরূপা কন্যাদের কথা ভেবে তাদেব বিয়ের সময় যাতে পাত্রপক্ষের অপছন্দ হওয়াব আশঙ্কা না থাকে তাব কথা ভেবে আবর তাদের সুরূপা বা সুন্দরী করবার কৌশল শেখাবার ভারও নিয়েছে 'যোগ বিবেক ভারতী।

কুরূপা মেয়েকে কি সুরূপা করা যায়?

যোগ বিবেক ভারতীর উত্তর—হ্যাঁ, করা যায়।

সে কী করে সম্ভব?

মা আনন্দ ভারতী নিজেই সেই বিদ্যে আয়ত্ত করেছেন। পাঞ্জাবী, গুজরাটি, বাঙালী, মারোয়াড়ি—সমস্ত সম্প্রদায়ের মেয়েদের এটাও একটা সমস্যা। তাদেব ভালো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পক্ষে শরীরে বেশি মেদ একটা প্রতিবন্ধক। সেই মেদ কমাবার বিদ্যে যদি জানতে চাও তবে এই "যোগ বিবেক ভারতী"তে এসো।

আবার এমন মেয়েও আছে যাদের শরীরে মেদ নেই। তাদের আবার উল্টো সমস্যা। তাদের শরীরে উপযুক্ত মেদ বাড়িয়ে তাকে সুন্দরী করতে হবে। তা করতে গেলেও এখানে এসো। এখান সে-ব্যবস্থাও অছে।

তারপর চোখ। অনেকের চোখ বেড়ালের মতো গোলাকার। সেটা অসুন্দর। সে-চোখকে পটল-চেরা চোখ করার বিদ্যেও এখানে শেখানো হয়। এমন কস্‌মেটিকস্‌ আছ যা চোখের ভুরুতে লাগালে গোলাকার চোখ পটল-চেরা চোখ হয়ে যাবে।

আর মাথার চুল ?

মেয়েদের মাথার চুল সৌন্দর্যের একটা অঙ্গ বিশেষ। সব খোঁপা সব মাথায় মানায় না। কোন খোঁপা কোন্ মাথায় মানাবে তা শিখিয়ে দেবে এই 'যোগ-বিবেক ভারতী'। বিভিন্ন মেয়ের মাথার বিভিন্ন আকার। কোনও মেয়েই জানে না তার মাথার কোন স্টাইলের খোঁপা মানাবে। সেটা শিখিয়ে দেওয়াও "যোগ বিবেক ভারতী"র কাজ।

গায়ের কালো রং তো আর ফর্সা করা যায় না।

কিন্তু তাহলে কালো রংওয়ালা মেয়েদের কপালে কি ভালো বর জুটবে না ? না, 'যোগ বিবেক ভারতী' তারও ব্যবস্থা করেছে। তারা এমন রং-এর শাড়ী-ব্লাউজ বা শালোয়ার কামিজ পরবে যে তাতে তাদের কালো রংটাকে অত কালো রং বলে মনে হবে না। 'যোগ বিবেক ভারতী' মেয়েদের গায়ের রং দেখে শাড়ি সালোয়ার কামিজের রং বাছাই করে দেবার কর্তব্যটাও শিখিয়ে দেবে।

এমনি কত রকমের উপকারের ব্রত নিয়েই 'মা আনন্দ ভারতী' একদিন এই "যোগ বিবেক ভারতী"র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ-ব্যাপারে তাঁর আরো একটা বিশেষ ব্রত আছে। গরীব মেয়েদের শারীর-সৌষ্ঠব-এর উন্নতির জন্যে "যোগ বিবেক ভারতী" যে সেবা করে তা নিঃশুল্ক। তার জন্যে কাউকে কোনও অর্থব্যয় করতে হবে না।

যে-সব কুরূপা মেয়ে "যোগ বিবেক ভারতী"তে শরীর সুন্দর করতে আসে তাদের প্রত্যেককে দিন-প্রতি একশো টাকা করে ফীজ দিতে হয়। কাউকে ম্যাসাজ নিতে হয়, কাউকে হট্-ওয়াটার বাথ্ নিতে হয়। নানারকম যন্ত্র-পাতি আছে "যোগ বিবেক-ভারতী,'তে। কারো হাঁইট্ কম, কারো পাছাটা আকারে ছোট, কারো নাক থাঁদা। প্রায় সমস্তরকম শরীরচর্চার ব্যাপারে যন্ত্র অপরিহার্য। সবরকমের স্বাস্থ্য-চর্চার জন্যে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োজন এই যোগ বিবেক ভারতী"তে স্বীকৃত। তাই প্রচুর বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়েছে। এতে অনেক টাকার প্রয়োজন অনিবার্য হয়।

কিন্তু গরীব বাপ-মা'র মেয়েদের জন্যে এক পয়সাও কাউকে দিতে হয় না। বড়লোকদের মেয়েদের দেওয়া টাকা থেকেই এই "যোগ বিবেক ভারতী"র ব্যয় নির্বাহ হয়।

এ ছাড়া আরো একরকমের আয় আছে "যোগ বিবেক ভারতী"র সেটা হচ্ছে বিয়ের সাজ-সজ্জা। বিয়ের কনেকেও এখানে সাজিয়ে-গুজিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের কনে কী-রং-এর বেনারসী শাড়ি পরবে, মাথার চুলে কীরকম খোঁপা হলে তাকে মানাবে তা ঠিক করবেন এরাই। সাধারণ মেয়েকেও এই সাজ-সজ্জার কল্যাণে অসাধারণ রূপসী বলে মনে হবে।

এই ব্যাপারে "যোগ বিবেক ভারতী" অনেক সময় পাঁচশো টাকা পর্যন্ত চার্জ করে থাকে। কিন্তু গরীব মেয়েদের ব্যাপারে কোন চার্জ নেবো না।

এই প্রতিষ্ঠানের পেছনে কে আছেন? কার নির্দেশে এই "যোগ বিবেক ভারতী" চলছে?

তাঁকে সাধারণতঃ চোখে দেখা যেত না। লোকে বলে তিনি আড়ালে থেকে এই প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন। তাঁর নাম "মা আনন্দ ভারতী।"

তাঁকে সাহায্য করতে ছিল—মা বিদ্যা ভারতী, মা শক্তি ভারতী, মা প্রজ্ঞা ভারতী—। এবং আরো অনেকে। তাঁরা মেয়েদের সেবা করতেন। মেয়েদের যত্ন করতেন। "যোগ বিবেক ভারত।" থেকে যা আয় হতো তা মেয়েদের সেবাতেই ব্যয় হতো। মেয়েদের উন্নতিতেই ব্যয় হতো, মেয়েদের মনুষ্যত্বকে জাগাতেই ব্যয় হতো।

মেয়ে জন্মাবার পর থেকেই সুজয়ের প্রধান ভাবনা ছিল বড় হলে ওই মেয়েকে পার করবে কী করে। নিজে তো অনেক মেয়ের বাপকেই সুজয় অনেক কষ্ট দিয়েছে। সেই সব কষ্ট তখন থেকে সুজয়কেই কষ্ট দিত।

শুধু যে সুজয়ের একলার কষ্ট হতো তাই-ই নয়, ইন্দুরও কষ্ট হতো। 'বুলা' বা 'মিথিলা'র বয়েস যত বাড়তে লাগলো তার বাবা-মা'র মনের

কষ্ট ততো বাড়তে লাগলো। সুজয় অবশ্য তার অফিসের কাজ নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকতো। কাজের মধ্যে ডুবে থেকেই সে খানিকটা মুক্তি পেত। কিন্তু বাড়িতে এসে বুলা'র দিকে তাকালেই তার বুকটা দূর-দূর করে উঠতো। ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় তার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটতো।

ইন্দু মাঝে-মাঝে সুজয়কে বলা—হ্যাঁ গো, কিছু উপায় করতে পারলে ?

সুজয় মাসের মধ্যে ছাব্বিশ-সাতাশ দিন বাইরে ঘুরে-ঘুরে যখন বাড়ি আসতো তখন ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে বিছানায় শুতে-না-শুতেই ঘুমিয়ে পড়তো।

ইন্দু জানতো যে এই দুর্ভোগের জন্যে দায়ী সুজয় নয়, দায়ী সে।

ইন্দু জানতো যে এই দুর্ভোগের জন্যে দায়ী সে নিজেই। জানতো যে ইন্দু নিজে যদি সুন্দরী হতো তাহলে তার বুলাও খানিকটা অন্ততঃ সুন্দরী হতো।

ইন্দু একদিন সুজয়কে বলেছিল—বুলা যে দেখতে খারাপ হয়েছে তার জন্যে তো আমিই দায়ী, না গো ?

সুজয় বলতো—না না, তা হবে কেন ? কত সুন্দরী মেয়ে আছে দেখেছি, অথচ তার মা সুন্দরী নয়। তুমি কেন ও-সব কথা ভাবছো ?

ইন্দু বলতো—আমি যে সুন্দরী নই তা কি আমার দোষ ?

সুজয় বলতো—তুমি ও নিয়ে বেশি ভেবো না। ও-সব নিয়ে তুমি যতো ভাববে ততই তোমার শরীর খারাপ হবে।

ইন্দু বললে—কিন্তু আমি কী করবো ? কথাগুলো যে সব সময়ে আমার ভেতরে ঘুর-ঘুর করে।

সুজয় স্ত্রীকে জীবনে কখনও অবহেলা করেনি। ইন্দুকে বিয়ে করে যে সুজয় অসুখী তার সামান্যতম আভাসটুকু পর্য্যন্ত তার মুখ থেকেও কখনও বের হতে শোনেনি ইন্দু। মেয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে তার বুকটা অনেকবার ফেটে যেত। কেন বুলার নাকটা অমন খাঁদা হলো ? কেন তার গায়ের রং অতো কালো হলো ? কেন কপালটা অত টেপা হলো ? কেন বুলা অত বেঁটে হলো ? বুলা হাসলে কেন ওকে অতো

খারাপ দেখায় ?

সুঞ্জয় বাড়িতে যেটুকু সময় পেতো বুলাকে কোলে নিয়ে আদর করতো। বাইরে থেকে যখনই বাড়ি ফিরতো তখনই কিছু-না-কিছু উপহার নিয়ে আসতো। হয় কোনও খেল্‌না, নয় তো কোনও পুতুল, নয় কোনও ফ্রক। আর নয় তো কোনও দামী চকোলেট বা খাওয়ার কোনও মিষ্টি।

ইন্দু এ-সব লক্ষ্য করতো। কিন্তু মুখ দিয়ে কিছু বলতো না। আর যত তার মনটা বিষিয়ে উঠতো ততো বুলাকে কোলে তুলে নিয়ে তার মুখে চুমু খেয়ে খেয়ে, আদরে তাকে ভাসিয়ে দিত।

বুলা অস্থির হয়ে উঠতো মা'র আদরের আতিশয্যে। কিন্তু যখন মা'র মুখের দিকে চেয়ে দেখতো তখন সে অবাক হয়ে যেত।

বলতো—মা তুমি কাঁদছো কেন ?

ইন্দু তার কান্না গোপন করবার জন্যে তাড়াতাড়ি নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ দু'টো মুছে ফেলে হাসতে হাসতে বলতো—কই, আমি তো কাঁদছি না। এই দেখ আমি কত হাসছি—দেখ দেখ—কত হাসছি আমি···

বলে প্রাণপণে হাসবার চেষ্টা করতো বার-বার। কিন্তু প্রত্যেক-বারই তার হাসিটা কান্নায় রূপান্তরিত হয়ে যেত।

বুলা বলতো—তুমি হাসছো কই মা ? তুমি তো কাঁদছো।

নেপিয়ার-টাউনের এক প্রতিবেশীর বাড়িতে একবার কোথা থেকে একজন জ্যোতিষী এসে হাজির হয়েছিল। খবর পেতেই ইন্দু বুলাকে কোলে করে নিয়ে সে-বাড়িতে হাজির। সে-বাড়িতে তখন জ্যোতিষীর সামনে অনেক ভিড়। সবাই তাকে নিজেদের হাত দেখাতে ব্যস্ত।

বাড়িতে তখন সংসারের নানা কাজ পড়ে পড়ে রয়েছে। তবু ইন্দু উঠলো না। বুলাকে নিয়ে সেখানে একপাশে বসে রইল সুযোগের অপেক্ষায়।

যখন দুপুর একটা তখন জ্যোতিষী-মহারাজের একটু সুযোগ হলো।

জ্যোতিষী মহারাজ ইন্দুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন—তোর কী কাজ মা ?

ইন্দু তাড়াতাড়ি বুলাকে নিয়ে জ্যোতিষীর সামনে গিয়ে বসলো। বললে—আমার এই মেয়েটার হাতটা একটু দেখে দিন দয়া করে—

জ্যোতিষী বুলার হাতটা নিয়ে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলেন—তুই কী জানতে চাস, বল্ ?

ইন্দু বললে—বড় হলে এর বিয়ে কী-রকম হবে সেইটে একটু বলে দিন—

জ্যোতিষী বুলার দু'টো হাতের পাতা দেখতে দেখতে বললেন—তোর এই মেয়ে বড় হয়ে রাজ-রানী হবে। অনেক বড় ঘরে এর বিয়ে হবে—

—হবে ?

যেন কথাটা বিশ্বাস হচ্ছিল না ইন্দুর। আবার জিজ্ঞেস করলে—সত্যিই খুব ভালো বিয়ে হবে ? এর কথা ভেবে ভেবে রাত্তিরে আমাদের কারো ভালো করে ঘুম হয় না—

জ্যোতিষী মহারাজ বললেন—তোর কিছু ভাবনা নেই, এ মেয়ে মহামায়ার অংশ। মহামায়াই এর ভবিষ্যতের ভার নিয়ে নেবেন—

ইন্দু সেদিন খুশী হয়েই বুলাকে নিয়ে চলে এসেছিল। মনে হয়েছিল সত্যিই তো, জীব দিয়েছেন যিনি তিনিই জীবকে দেখবেন। সে কেন তা নিয়ে ভাবছে মিছি মিছি !

সেবার সুজয় ডিউটি থেকে ফিরে আসতেই ইন্দু দৌড়ে তার কাছে গেল।

বললে—জানো, চৌহান সাহেবের বাড়িতে একজন জ্যোতিষী এসেছিল। খুব নামকরা জ্যোতিষী। আমি বুলাকে নিয়ে তার কাছে গিয়েছিলুম—

সুজয় বললে—তাই নাকি ?

ইন্দু বললে—হ্যাঁ, বুলার হাতটা দেখে জ্যোতিষী কী বললে, জানো ? বললে ও নাকি বড় হলে দেখতে ভালো হয়ে যাবে। ওর

বিয়েও খুব ভাল ঘরে হবে। ও বিয়ে করে খুব সুখী হবে।

সুজয় বললে—আর তোমার নিজের সম্বন্ধে কী বললে জ্যোতিষী ?

ইন্দু বললে—আমি নিজের হাত দেখাইনি। বুলাকে নিয়েই ভাবছিলুম তাই বুলার হাতটা দেখিয়ে ছিলুম। আমার নিজের তো কোনও সমস্যাই নেই—

তা বটে। সুজয়ও তার বুলাকে নিয়ে খুবই চিন্তিত থাকতো। সে-সম্বন্ধে ভেবে কোনও লাভ নেই জেনে নিজের কাজের মধ্যে ডুবে গিয়েই সে শান্তি পেতে চাইতো। সে একটু গম্ভীর হলেই ইন্দু মনে মনে কষ্ট পেত। বলতো—আবার তুমি বুলার কথা ভাবছো ? জ্যোতিষী তো বলেই দিয়েছে বুলাকে নিয়ে ভাববার কোনও দরকার নেই, ওর খুব ভালো বিয়ে হবে !

সুজয় বলতো - না না না, বুলার কথা ভাবছি না, আমি নিজের একটা কেস নিয়ে ভাবছি—

সত্যিই সুজয়কে অফিসের অনেক কেস নিয়ে দিন-রাতই ভাবতে হতো, রাত্রে ঘুমোতে গিয়েও তার মনে শান্তি আসতো না। কেবল মনে হতো কোন্ কেস্ নিয়ে কী-কী সমস্যা তার হতে পারে। তারপর যখন একটা ঘুষ-খোরকে নিখুঁতভাবে ধরতো তখন আনন্দও পেত সে অসীম। এই সূত্রে চাকরিতে তার প্রমোশনও হতো ঘন-ঘন। অফিসের ওপর মহলে এই জন্যে তার সুনামও দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছিল।

এমনি সময়ে হেড-কোয়ার্টার থেকে প্রায় পনেরো দিন বাইরে থেকে যখন সে বাড়িতে ফিরে এল তখন দেখলে বুলা বাড়িতে নেই।

সুজয় স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে—বুলা কোথায় গেল ?

ইন্দু হাসতে হাসতে কাছে এসে বললে—বুলাকে স্কুলের বোর্ডি-এ ভর্তি করে দিয়ে এসেছি—

—স্কুল ? কোন স্কুলের বোর্ডি-এ ?

ইন্দু বললে—নাগপুরের "যোগ বিবেক ভারতীতে"—

—"যোগ বিবেক ভারতী ?" সে আবার কী ?

ইন্দু বললে—সে একটা মেয়েদের বোর্ডিং স্কুল। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখান আবার যোগ-ব্যায়ামও শেখানো হয়।

—যোগ-ব্যায়াম ?

ইন্দু বললে—হ্যাঁ। দেখলুম অনেক বড়-বড়লোকের মেয়ে-বউরা ওখানে এসে যোগ-ব্যায়াম করছে। মোটা মেয়েদের দোহারা চেহারা করে দিচ্ছে, রোগারা মোটা হতে চাইছে। আর কারো ফিগার খারাপ তাদের ফিগার ভালো করে দিচ্ছে। দেখতে খারাপ বলে যাদের বিয়ে হতে অসুবিধে হয় তাদের জন্যে 'যোগ বিবেক ভারতী'র বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

সুঞ্জয় শুনছিল। এবার জিজ্ঞেস করলে—যারা বেঁটে তাদের হাইট বাড়াতে পারবে ?

ইন্দু বললে—হ্যাঁ, মা-শক্তি-ভারতী তো তাই বললেন আমাকে—

সুঞ্জয় কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—যাদের নাক খাঁদা তাদের নাক টিকোলা করে দিতে পারবে ?

ইন্দু বললে—হ্যাঁ, ছোটবেলা থেকে ব্যায়াম আর ম্যাসাজ করলে তাও করে দেবে। আমি তো সেই সব মেশিন দেখে এলুম। যাদের খাঁদা নাক ছিল তাদের সকলেরই নাক টিকোলো হয়েছে, আমাকে দেখালে। সব কাজ মেশিনে হচ্ছে, দেখে এলুম। মা-শক্তি-ভারতী নিজে আমাকে সব ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখালেন। ওদের 'বিউটি-পারলারে' কত মেয়ে যে ম্যাসাজ করছে তার ঠিক নেই। আর কতরকম যে মেশিন কিনেছে তারও হিসেব নেই—

—কত টাকা মাইনে লাগবে ?

ইন্দু বললে—বুলার জন্যে মাসে লাগবে খাওয়া-থাকা-যোগ-ব্যায়ামের জন্যে সব মিলিয়ে মাত্র তিন'শো টাকা।

সুঞ্জয় বললে—খুবই সস্তা তো! এত সস্তায় কেন করছে ?

ইন্দু বললে—এ যে সমাজ-সেবা। 'মা আনন্দ ভারতী' মেয়েদের কথা ভেবেই নাকি এই 'যোগ-বিবেক ভারতী'র 'প্রতিষ্ঠা করেছেন শুনলাম।

—মা আনন্দ ভারতী? সে আবার কে?

ইন্দু বললে—তা জানি না। শুনলাম মেয়েদের দুঃখ দেখে তিনি নাকি নিজের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী করে এই ইস্কুলটা করেছেন।

—তুমি তাঁকে দেখলে?

ইন্দু বললে—তাঁকে কেউ দেখতে পায় না। তিনি নিজের কাজে এত ব্যস্ত যে কারোর সঙ্গে দেখা করবার সময়ও পান না। তাঁর অন্য মেয়েরা সমস্ত কাজগুলো দেখা-শোনা করেন। মা শক্তি ভারতী, মা বিদ্যা ভারতী, মা জ্ঞান ভারতী। এই সব নাম ··

তখন থেকেই বুলা ওই "যোগ বিবেক ভারতী"তে লেখা-পড়া শিখছে। আস্তে আস্তে নাকি চেহারাও সুন্দর হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে যোগ ব্যায়ামও করছে। তাতে নাকি বুলার খুব উন্নতিও হচ্ছে তখন। আর মেয়ের জন্যে সুজয় চার-পাঁচ'শো টাকা খরচ করতে কার্পণ্য করছে না। বুলার ভবিষ্যৎ যদি ভালো হয়, বুলার যদি ভালো ঘরে বিয়ে হয় তাহলে সুজয়ের মত সুখী আর কে হবে পৃথিবীতে?

জব্বলপুরে গিয়ে আমি সুজয়ের এই কাহিনী শুনে এসেছিলাম। আর সুজয়ের এই পরিবর্তনও দেখে এসেছিলাম।

ফেরবার সময় ট্রেনে বসে বসে তাই আমি ভাবছিলাম যে মানুষের জীবনে কতরকম পরিবর্তনই না আসে। যে-সুজয়ের বাবা-মা ছেলের বিয়ে নিয়ে কত ভেবেছিলেন, ছেলেকে সুখী করবার জন্যে বাড়ি-বাড়ি মেয়ে দেখে বেড়িয়ে ছিলেন, বরদা ঘটককে কত টাকা দিয়েছিলেন, সেই তিনিই কি তাঁর সুজয়ের সংসারের এই সমস্যার কথা কল্পনা করতে পারতেন!

যথা সময়ে প্রাণত্যাগ করে তিনি সত্যিই বেঁচে গিয়েছিলেন, নইলে এ-সব সমস্যা তো তাকে নিজের চোখেই দেখতে হতো। তার মা বরাবরই ছিলেন অল্প কথার মানুষ। এখন তার মা'ও আর নেই।

বিয়ের আগে স্ত্রী বাছাই করা চলে। একজনকে দেখে অপছন্দ হলে অন্য একজনকে পছন্দ করার সুযোগ থাকে।

কিন্তু সন্তান?

সন্তানের ব্যাপারে পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্নই ওঠে না। তাকে সংশোধন করার বা শিক্ষিত করে তোলার সমস্যা থাকলেও পরিত্যাগ করার বাসনা সমাজে বাতিল বলেই গ্রাহ্য হয়ে থাকে।

তা সেই সুজয়ের সমস্যা নিয়ে কিছু লেখা যায় কিনা অনেকবার ভেবেছি। ফ্রান্সের মনীষী রুশো নিজের সন্তানদের বাড়িতে মানুষ করে না তুলে গীর্জার দাতব্যশালায় রেখে দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সে তো আজ থেকে দু'শো বছর আগেকার ঘটনা। তাও আবার এ দেশে নয় পাশ্চাত্য দেশে। কিন্তু এই ইণ্ডিয়ায় ?

ইণ্ডিয়ায় আজকাল আবার আর এক-রকমের নতুন ব্যবসা শুরু হয়েছে। তা হচ্ছে অভিভাবকহীন ছেলে-মেয়ে বেচা-কেনার ব্যবসা। এ-ব্যবসা এখানে প্রথম শুরু করে একজন মহিলা খ্রীষ্টান মিশনারী। তার দেখাদেখি ইণ্ডিয়ায় আরো অনেকেই আরম্ভ করেছে এই পেশা। পেশা হলেও এর কৌলিন্য আলাদা। এ চাল-ডাল-তেল-নুন-লোহা-লক্কড়ের মতো ঘৃণ্য বা সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের পেশা নয়। তার ওপর এতে ইনকাম-ট্যাক্স বা ওয়েলথ্-ট্যাক্সের বালাই নেই। বরং পরোপকার-রূপ এক বিচিত্র ধরনের গৌরব-বোধ আর গর্ব-বোধ আছে এতে।

ভেবেছিলাম সেই দৃষ্টি-কোণ থেকে কোনও কাহিনী লিখবো।

কিন্তু আমার সব পরিকল্পনা আমূল পরিবর্তন করতে হলো একটা বিশেষ ঘটনায়।

কেন আমার পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হলো তাই বলি ঃ

হঠাৎ কয়েক বছর পরে সুজয় একদিন আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হওয়াতে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছি।

বললাম—কী রে, তুই ?

সুজয় বললে—আমার সে-চাকরি চলে গেছে রে—।

—চলে গেছে ? তার মানে ? অত ভালো চাকরিটা তোর চলে গেল ?

সুজয় বললে—জব্বলপুর থেকে আমি চলে এসে এখন আবার রেলের পুরনো চাকরিতে চলে এসেছি—

—কেন ?

সুজয় বললে—সে এক লম্বা ইতিহাস রে ! তা বলতে অনেক সময় লাগবে। তুই তো গল্প লিখিস, তাই তা বলতেই আমি তোর কাছে এলাম।

বললাম—ব্যাপারটা কী ?

সুজয় বললে—শেষ পর্যন্ত সে এলো ভাই। সত্যিই সে এলো। অথচ একদিন আমরা কত আশা করেছিলাম সে আসবে। সে এসে আমাদের সংসার আলো ভরে দেবে। অথচ এখন ভাবছি তখন যে সে আসেনি তা আমার পক্ষে ভালোই হয়েছে।

কেন ?

সুজয় বললে—তখন এলে তো বুঝতেই পারতাম না আমরা কত অন্ধকারের মধ্যে বাস করছি। কত ঘুষ, কত পাপ, কত অনাচার, কত অত্যাচার, কত অবিশ্বাস, কত কালো টাকা আমাদের জীবনকে কলঙ্কিত করে চলেছে—

আমি বললাম—সে কী রে, ঘুষ ধরাই তো তোর চাকরি ছিল। তোর কাছে তো এ সব কোনও নতুন জিনিস নয়।

সুজয় বললে—না ভাই, ঘুষ নেওয়া বা দেওয়া, দু'টোই তো ক্রাইম। ও-সব আমি অনেক দেখেছি। আমি এতো কম সময়ের মধ্যে যত ক্রাইম-কেস্ ধরেছি, আমার আগে ওই সময়ের মধ্যে আর কেউ তা ধরতে পারেনি। জানিস, আমি এই ক'বছরের মধ্যে ইণ্ডিয়ার প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে ছ'টা কমেণ্ডেশন-সার্টিফিকেট পেয়েছি, যা আর কেউই পায়নি—

বললাম—তাহলে কেন ওরা ছাড়লো তোকে ?

সুজয় বললে—আরে সেইটেই তো গল্প। তুই এটা নিয়ে গল্প লিখতে পারিস—

আমি চুপ করে রইলাম।

সুজয় আবার বললে—জীবনটা ভাই সত্যিই বিচিত্র। শুধু জীবন নয়, এই পৃথিবীটাও বড় বিচিত্র। আজ পর্যন্ত কেউ এর আদি-অন্ত খুঁজে পায়নি। তবু যুগ-যুগ ধরে এর রহস্য খুঁজে বার করতে মানুষের চেষ্টার আর শেষ নেই। এখনও সেই রহস্য খুঁজে বার করতে মানুষ আকাশে উড়ছে, মানুষ জলের তলায় ডুবছে, মানুষ বনে-জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা করছে। অথচ আমাদের পাশের বাড়ির মানুষকেই আমরা জানতে পারছি না, জানতে চেষ্টাও করছি না।

একটু থেমে সুজয় আবার বলতে লাগলো—সেই সব দিনগুলোর কথা তোর নিশ্চয় মনে আছে। তখন কতো তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাতুম। সাবান, স্নো, ক্রিম, পাওডার, আরো কত কী সব জিনিস—যেগুলো ভাবলেও এখন হাসি পায়। তারপর ছিল সিনেমার নেশা। লোকে সিনেমাকে বলে আর্ট। সিনেমাকে বিজ্ঞান বললে আমার আপত্তি হতো না। কিন্তু আর্ট!

যাক্ ও-সব বাজে কথা! ভাগ্যিস আমার মেয়ে রূপসী হয়নি। রূপসী হলে তো আর নাগপুরের 'যোগ বিবেক ভারতী'র সন্ধান পেতুম না। আর তার 'মা আনন্দ ভারতী'র সন্ধান পেতুম না আমি—

—কীরকম?

আমি সুজয়ের কথার কোনও মানে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তার নিজের চাকরির সঙ্গে 'যোগ বিবেক ভারতী'র সম্পর্কই বা কী?

তারপর সুজয় যে-কাহিনীটা আমাকে বললে সেটা শুনে আমিও স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

সুজয়ের অনেক 'ইন্‌ফরমা'র ছিল—সে-কথা তো আগেই বলেছি।

নাগপুর থেকে একদিন তার ইন্‌ফরমার খবর দিলে যে একটা কেস্-এর খবর আছে। খবরটা পেয়েই সুজয় সেই ইনফরমারের সঙ্গে দেখা করতে গেল নাগপুরে।

সুধাকর খারে লেখা-পড়া জানা ছেলে। কিন্তু কার্যগতিকে তখনও সে কোনও চাকরি পায়নি। একদিন চায়ের দোকানে বসেই সুজয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সুজয় নিজেই সুধাকরের চায়ের দামটা দিয়ে দিয়েছিল। দামটা বেশি নয় মাত্র দু'টাকা।

কিন্তু সুধাকর বলেছিল—আপনি কেন দাম দিচ্ছেন দাদা?

সুজয় বলেছিল—আপনার ভাই চাকরি নেই, আপনি কোত্থেকে পয়সা দেবেন?

পুলিশের লাইনে এইটেই নিয়ম। বিশেষ করে সি-বি-আই-এর চাকরিতে। মানুষের কাছে নিজের পরিচয় গোপন রেখে অচেনা লোকের সঙ্গে অকারণে আলাপ জমাতে হয়। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোথায় কে ঘুষ নিচ্ছে, কোথায় কে চুরি করছে, তার হদিস পাওয়া।

এতে সব সময়ে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তা নয়। কিন্তু এইরকম দু'দশজনের সঙ্গে মিশতে মিশতে এক-জায়গায় না এক জায়গায় একটা কেস হাতে এসে যায়ই।

অনেক সময়ে এই সব কাজে অন্ধকারেও ঢিল ছুঁড়তে হয়। দশটা কেস হাতে নিলে হয়তো তার মধ্যে একটা মাছ ছিপে ওঠে। কত মাছ যে বঁড়শি ছিঁড়ে পালিয়ে যায় তার কোনও হিসেব কোথাও থাকে না।

মানুষটার নাম মিস্টার যশোবন্ত ভার্গব। সরকারি চাকরিতে একজন জাঁদরেল অফিসার। চোখে মুখে তাঁর কথা। আসলে তার পদটা হচ্ছে ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার কমিশনারের। তিনি একজন আই-এ-এস।

সরকারী কোনও কর্মচারী যদি সরকার থেকে ফ্ল্যাট কিনতে চান তো দরখাস্তে কমিশনার সই করে দিলেই তিনি এক লক্ষ টাকা অগ্রিম লোন পেয়ে যাবেন।

আপনি যদি কোনও কারখানা করতে চান তো কন্ট্রোল দামে সিমেন্ট লোহা কাঠ ইঁট কিনলে আপনার সুবিধে হবে। যদি আপনার বাজেট পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার মধ্যে হয় তো সেই কমিশনার সই করে দিলেই আপনি সমস্ত সরকারী সাহায্য পেয়ে যাবেন। অর্থাৎ পনেরো

পার্সেন্ট কম দামে আপনি বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন রেডিও কিংবা টি ভি-তে। যে-কোনও সরকারী প্রচার-যন্ত্রেও যদি আপনি আপনার পণ্য দ্রব্যের প্রচার করতে চান তো তাতেও আপনি পনেরো পার্সেন্ট কমিশন পেয়ে যাবেন।

অন্য আরো একটি অমূল্য সুবিধে পেয়ে যাবেন।

সেটা কী ?

সুবিধেটা হলো জমি-জমার সীলিং !

আইন অনুযায়ী ইণ্ডিয়ার যে-কোনও লোক একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জমি নিজের নামে রাখতে পারেন। তার বেশি হলে সেই সমস্ত জমি সরকারে বর্তাবে। অর্থাৎ তার সীলিং বহির্ভূত যে-জমি উদ্বৃত্ত হবে তার মালিক হবে সরকার।

এত সব সুবিধে করে দেওয়ার মালিক হচ্ছেন কমিশনার মিস্টার যশোবন্ত ভার্গব, আই-এ-এস। তিনি সই করে দিলেই সমস্ত বেআইনী কাজ আইন-সিদ্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু এ-ব্যাপারেও একটা শর্ত আছে।

শর্তটা কী ?

শর্তটা হচ্ছে এই যে তাঁকে তার জন্যে পঁচিশ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হবে।

আর সেই ঘুষের টাকাটা দেওয়ার একটা বিশেষ পদ্ধতিও আছে।

কী সেই পদ্ধতি ?

পদ্ধতিটা হচ্ছে এই যে তিনি তাঁর অফিসে বসে এই পঁচিশ হাজার টাকার ঘুষটা নেবেন না। যিনি ঘুষ দেবেন তাঁকে তাঁর বাড়ির সামনে তালা-বন্ধ লেটার-বক্সের ভেতরে রাত দুটোর সময় ফেলে দিয়ে আসতে হবে।

বললাম—তারপর ?

সুজয় বললে—তারপর মিস্টার ভার্গব রাত আড়াইটের সময়ে নিজে উঠে এসে লেটার-বক্সের তালা খুলে টাকাটা বার করে নেবেন। কে কাকে কখন টাকাটা দিলে তা কারোরই জানবার উপায় থাকবে

না। কে কখন লেটার-বক্স থেকে টাকাটা বার করে নিলে তাও কারো জানবার উপায় থাকবে না।

ঘুষ নেওয়ার এই অভিনব পদ্ধতিটাও মিস্টার ভার্গব নিজেই অবিষ্কার করেছিলেন। সেই জন্যেই আমাদের কেউই তখনও পর্যন্ত তাঁকে হাতে-নাতে ধরতে পারেনি।

খবরটা প্রথমে আমাকে দেয় ওই সুধাকর খারেই।

সে-ই বলেছিল—দাদা ওই লোকটাকে আপনি ধরুন। অত বড় শয়তান এত টাকার মালিক হয়ে দিন-দুপুরে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে, এটা আমাদের আর সহ্য হয় না। ওকেই আবার আমাদের গভর্নমেণ্ট 'পদ্মশ্রী' উপাধি দিয়েছে—

—তাই নাকি? 'পদ্মশ্রী' উপাধি পেয়েছে মিস্টার ভার্গব?

সুধাকর খারে বললে—কেন পাবে না বলুন? ওর তো টাকার অভাব নেই। আজকাল তো টাকা দিলে সব কিছুই কিনতে পাওয়া যায়। তাই উনি গভর্নমেণ্টকেও টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছেন। আর শুধু কি 'পদ্মশ্রী'? উনি আবার এখানকার "যোগ-বিবেক ভারতী'র প্রেসিডেণ্ট—

সুজয় অবাক হয়ে গেল খারের কথা শুনে। বললে—'যোগ বিবেক ভারতী'র প্রেসিডেণ্ট ঘুষ-খোর কমিশনার ওই লোকটা? ওটা তো একটা সমাজকল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠান। ওরা কেন এঁকে প্রেসিডেণ্ট করলে?

সুধাকর খারে বললে—ওদের দোষ নেই। উনি তো একজন আই-এ-এস মানুষ, তার ওপর 'পদ্মশ্রী' উপাধি পাওয়া লোক। ও রকম রেসপেকটেবল লোক তো নাগপুরে আর দ্বিতীয় কেউ নেই -

সুজয় বললে—আমার মেয়ে তো ওই স্কুলেই বোর্ডিং-এ থেকে পড়ে। ওদের তো খুব সুনাম শুনেছি, তাই আমার স্ত্রী আমার মেয়েকে ওই স্কুলেই ভর্তি করে দিয়েছে। ওদের 'মা-আনন্দ-ভারতী' নাকি খুব ভালো মহিলা। আবার নিজেও একজন ব্রহ্মচারিণী—

খারেও স্বীকার করলে সুজয়ের কথা। বললে—তা আপনি ঠিকই

বলেছেন, কিন্তু 'মা-আনন্দ-ভারতী'র কী দোষ? ওঁরা মিস্টার ভার্গবের চেয়ে ভালো লোক আর কোথায় পাবেন? তার ওপর অত বড় গভর্মেন্ট অফিসার, আই এ-এস, 'পদ্মশ্রী' উপাধি পাওয়া লোক। এক সঙ্গে এত গুণী লোক নাগপুরে কে খুঁজে পাবে? ওঁদের কোনও দোষ নেই দাদা—

সুজয় জিজ্ঞেস করলে—কতো টাকা ঘুষ চান উনি, ওই মিস্টার ভার্গব?

খারে বললে—ওঁর বাঁধা রেট, পঁচিশ হাজার টাকা—

—এমন একটা পার্টি জোগাড় করতে পারো যে ওঁকে ধরিয়ে দিতে পারে?

খারে বললে—খুব পারি। আমাদের পাড়াতেই আছেন মিস্টার খান্না। তিনি ওঁর ওপর খুব খাপ্পা।

সুজয় জিজ্ঞেস করলে—কেন খাপ্পা?

সুধাকর খারে বললে—ভদ্রলোকের নাম ওমপ্রকাশ খান্না। তাঁর একটা নিজস্ব ফ্যাক্টরি আছে। কিন্তু যে-জমিটার ওপর সে ফ্যাক্টরিটা আছে সেটা তাঁর সীলিং-এর আওতার বাইরে পড়েছে। এ-ছাড়া ওঁর অন্য জায়গায় আরো জমি-জমাও আছে অনেক। একবার যদি খান্নাজীর জমি-জমার হিসেব-পত্রের কাগজে মিস্টার ভার্গব একটা সই করে দেন তাহলে মিস্টার খান্নার অনেকগুলো টাকা বেঁচে যায়। কিন্তু মিস্টার ভার্গব পঞ্চাশ হাজার টাকা চাইছেন।

—কেন?

—মিস্টার ভার্গব বলছেন সব জিনিসপত্রের দাম হু-হু করে বেড়ে চলেছে, তাই ঘুষের রেটও বাড়াতে হবে—

সুজয় বললে মিস্টার খান্না আমাকে যদি একটু সাহায্য করেন তাহলে আমি মিস্টার ভার্গবকে জব্দ করতে পারি—

সুধাকর খারে জিজ্ঞেস করলে—আপনি কী করে জব্দ করবেন?

সুজয় বললে—সে সব তুমি আমাদের ওপর ছেড়ে দাও। সে আমাদের ডিউটি—তুমি শুধু আমাকে মিস্টার খান্নার সঙ্গে একবার

আলাপ করিয়ে দাও—

সুধাকর খারে বললে—ঠিক আছে, আমি আজকেই তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব। আপনি আজ রাতটা নাগপুরে থাকুন—

বলে খারে চলে গেল। আর আমি আমার হোটেলে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

সন্ধ্যের পর সুধাকর খারে মিস্টার ওমপ্রকাশ খান্নাকে আমার হোটেলের নিজস্ব ঘরে নিয়ে এল।

খান্নাজীর সঙ্গে খারে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে। খান্নাজীর চেহারা দেখলেই বোঝা গেল যে তিনি অবস্থাপন্ন বংশের মানুষ। নিজে অনেক পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তার ওপর নিজেও অনেক সম্পত্তি সংগ্রহ করেছেন। এখন মুশকিল হয়েছে সরকারী সিলিং আইন নিয়ে। তাঁর নিজের অনেক সম্পত্তি ছেলেমেয়েদের নামে হস্তান্তর করে দিয়েও নিজের নামে যে-জমি আছে তা সরকারী আইনে আটকাচ্ছে। তিনি অনেকবার মিস্টার যশোবন্ত ভার্গবের সঙ্গে এই নিয়ে দেখাও করেছেন। কিন্তু ভার্গবের ওই একই উত্তর। তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকার কমে সই করবেন না। অথচ সই না করলে লাখ-লাখ টাকা তাঁর লোকসান হয়ে যাবে।

সব শুনে আমি বললাম—আপনি কি চান যে মিস্টার ভার্গবের চাকরি যাক্? আপনি কি চান যে মিস্টার ধরা পড়ুন?

খান্নাজী বললেন—হ্যাঁ, আমি চাই ওঁর চরম সর্বনাশ হোক।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—মিস্টার ভার্গব কি বিবাহিত? ওঁর ছেলেমেয়ে ক'জন? খুব কি বড় ফ্যামিলি চালাতে হয় ওঁকে? নইলে অত টাকায় লোভ কেন ওঁর।

খান্নাজী বললেন উনি বিয়েই করেননি তো ছেলে-মেয়ে কোথা থেকে আসবে? ওঁর কাছে টাকাই হলো ওঁর বউ-ছেলে-মেয়ে সব কিছু—

সুজয় বললে—আপনি আমাকে লিখিতভাবে এই সব কথা জানাতে

পারবেন ?

খান্নাজী বললেন—আপনি যদি বলেন তো এখনই ও-সব কথা লিখে দিতে পারি।

সুজয়ের কাছ থেকে একটা কাগজ নিয়ে খান্নাজী তখনই তাঁর সমস্ত অভিযোগ তাতে লিখে দিলেন।

এর পরে সুজয় আবার পরের দিনই জব্বলপুরের নেপিয়াব টাউনে ফিরে এলো। তারপর ডি-আই-জি'র সঙ্গে এ নিয়ে অনেক আলোচনাও হলো। আগেকার দিনে যে-ভাবে ঘুষখোরদের ধরা হতো, তা এখন বাতিল হয়ে গিয়েছে। এখন অন্য রকম নিয়ম হয়েছে। ঘুষের টাকার গায়ে গুঁড়ো কেমিক্যাল মিশিয়ে দেওয়ার নিয়ম হয়েছে। ঘুষখোর যদি টাকাগুলো হাত দিয়ে ছোঁয় তাহলে তাব হাতে সেই কেমিক্যালের গুঁড়ো লেগে যাবে। সেই হাত জলের গেলাসে ডোবালেই জলটা লাল হয়ে যাবে।

তা আবার ক'দিন পরেই সুজয় খান্নাজীর বাড়িতে গেল। সেখানে খারেও হাজির ছিল। কবে কখন খান্নাজী মিস্টার ভার্গবের কাছে যাবেন তাও ঠিক হয়ে গেল। মিস্টার ভার্গব যে-দিনটা স্থির করে দেবেন সেই দিন রাত দুটোর সময় খান্নাজী দশ টাকার নোটে পঞ্চাশ হাজার টাকা তাঁর লেটার-বক্সের ভেতরে রেখে দিয়ে আসবেন। আর মিস্টার ভার্গব রাত আড়াইটের সময় সেই টাকাগুলো লেটার-বক্স থেকে বার করে বাড়ির ভেতরে ঢুকবেন আর তখনই সুজয় সদলবলে ভিতরে ঢুকে পড়বে। আর সঙ্গে সঙ্গে এক বাটি জলের মধ্যে মিস্টায় ভার্গবকে ডান হাতটা ডুবোতে বলবে। জলটা সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে উঠলেই তাঁকে আইন অনুযায়ী গ্রেফতার করা হবে।

সুজয় বললে—তাই বলছিলাম ভাই, শেষ পর্যন্ত সে এলো।

অথচ কতদিন আগেই তো আসার কথা ছিল তার। আমার আত্মীয়-স্বজন বাবা মা সবাই কত আশা করেছিল যে সে এসে আমাদের সংসার আলো করে দেবে।

কিন্তু তখন ভাবলাম সেদিন সে না এসে ভালোই করেছে। আগে এলে তো জানতে পারতাম না যে কত ঘুষ, কত পাপ, কত অন্যায়, কত অনাচার, কত অত্যাচার, কত অবিশ্বাস আমাদের দেশকে গ্রাস করে ফেলেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তুই কার কথা বলছিস?

সুজয় বললে—সেই জয়ন্তীর কথা বলছি, জয়ন্তী মুখার্জি—

আমি বললাম—তুই তো খান্নাজী আর মিস্টার ভার্গবের কথা বলছিলি। এর মধ্যে আবার জয়ন্তীর কথা এলো কী করে?

সুজয় বললে—এই খান্নাজী আর মিস্টার ভার্গবের কথা না বললে তো জয়ন্তী মুখার্জির কথা বলা যাবে না।

তার মানে?

সুজয় বললে—আজকে বসন্তটা বেঁচে থাকলে সে খুব মজা পেত রে। হঠাৎ মারা গিয়ে বসন্তটা আজ দেখতেই পেলে না জয়ন্তী মুখার্জিটা কত ধড়িবাজ মেয়ে, কত জাঁহাবাজ মেয়ে। একদিন আমার সঙ্গে তার বিয়ের তো পাকাই হয়ে গিয়েছিল। নেমন্তন্নর চিঠি পর্যন্ত ছাপা হয়ে গিয়েছিল। সেই অবস্থায় ওই মেয়েটা সমস্ত কাঁচিয়ে দিয়েছিল বসন্তকে আর আমাকে অপমান করে—

বললাম—সে তো আমি জানি সব। কিন্তু সেই জয়ন্তী এখন তোর কাছে এল কী সূত্রে?

সুজয় বললে—সেইটে বলতেই তো তোর কাছে আসা। তুই লেখক মানুষ, হয়তো জয়ন্তীকে নিয়ে একটা গল্প কি উপন্যাসও লিখে ফেলতে পারিস—

বললাম—বল্, তাড়াতাড়ি বল্। আমি বুঝতে পারছি না মিস্টার ভার্গব আর খান্নাজীর সঙ্গে জয়ন্তী মুখার্জির কী সম্পর্ক? জয়ন্তী তো কলকাতার মেয়ে। সে তোর জব্বলপুরে কী করে গেল?

—তবে শোন –

বলে সুঞ্জয় তার পুরো কাহিনীটা বলতে লাগলো।

আগে যেমন প্ল্যান করে রাখা হয়েছে খ'ন্নাজী আর সুধাকর খারের সঙ্গে, সেই প্ল্যান অনুযায়ীই কাজ হলো। রাত দুটোর সময় খান্নাজী মিস্টার ভার্গবের বাড়ির তালা-বন্ধ লেটার-বক্সে কেমিক্যাল গুঁড়ো মাখানো পঞ্চাশ হাজার টাকা ফেলে দিয়ে এসেছিল। আমরা তখন অনেক দূর থেকে তা লক্ষ্য করছিলাম। দেখি ঠিক তার আধ-ঘণ্টা পরে মিস্টার ভার্গব বাড়ির সদর দরজা খুলে বাইরে এলেন। তারপর লেটার-বক্সের তালাটা খুলে টাকাগুলো বার করে নিয়ে পকেটে রেখে আবার লেটার-বক্সের চাবি-তালা বন্ধ করে দিলেন। তারপর আবার বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। আমরা দূর থেকে সব দেখছিলাম। আমার সঙ্গে আমাদের ডিপার্টমেণ্টের আরো দুজন ছিল। তাদের নিয়ে আমরা দরজার কলিং-বেল টিপতেই একটা চাকর দরজা খুলে দিলে।

আমরা তাড়াতাড়ি মিস্টার ভার্গবকে গিয়ে ধরলুম।

তিনি তখন সেই দশ টাকার নোটগুলো একমনে একটা-একটা করে গুনছেন। হঠাৎ আমাদের দিকে নজর পড়তেই তিনি চমকে উঠলেন। আমরা ফ্ল্যাস্কে করে জল নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই জলে তার হাত ডোবাতে বললাম।

তিনি আমাদের আইডেনটিটি কার্ড দেখাতে বললেন।

আমরা তা দেখাতেই তিনি জলে হাত ডোবালেন। সঙ্গে সঙ্গে জলটা লাল হয়ে উঠলো।

বিরাট জাঁদরেল আই-এ-এস কমিশনার। 'পদ্মশ্রী' উপাধি পাওয়া। আমরা তাকে গ্রেফতার করতেই তিনি যেন প্রথমে একটু মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু তখনই আবার সামলে নিলেন নিজেকে—

সুঞ্জয় এবার গল্প বলতে বলতে থামলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম – তারপর ?

সুঞ্জয় বলতে লাগলো—তারপর তিনি জামিনে ছাড়া পেলেন। আর তারপর কোর্টে একদিন তাঁর মামলাটা উঠলোও। কিন্তু মাস

দু'এক মামলাটা চলার পর একদিন হাকিম তাঁকে ছেড়ে দিলেন। ভাবতে পারো এমন কাণ্ড ?

আমি জজের রায় শুনে প্রথমে খানিকটা অবাকই হয়েছিলাম। কিন্তু বুঝলাম যে এই কালোবাজারি, এই ঘুষ, এই অন্যায় আর এই অনাচারের যুগে সবই হয়তো সম্ভব। বলা যায় না।

কিন্তু বহু বছর সি-বি আইতে ডেপুটেশনে থেকে প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে দু'টা কমেণ্ডেশন সার্টিফিকেট পেয়েও যা অভিজ্ঞতা হয়নি, এই মিস্টার ভার্গবের একটা মামলার সূত্রে যা শিখলাম তা সত্যিই একেবারে নতুন। এই একটা কেসেই বলতে গেলে আমার দিব্য-দৃষ্টি খুলে গেল। শুনেছিলাম আফ্রিকার নতুন স্বাধীন হাওয়া দেশগুলোর মন্ত্রীরা অফিসের টেবিলে বসে ঘুষ নেয়। নিজের চোখে অবশ্য তা দেখবার দুর্ভাগ্য আমার হয়নি। ভেবেছিলাম যে-ইণ্ডিয়ায় উপনিষদ বেদ গীতার মতো বই লেখা হয়েছে সেদেশে এরকম হওয়াটা অসম্ভব। অন্ততঃ একটু চক্ষু-লজ্জা থাকবে। কিন্তু তাও এখানে নেই।

তুই তো জানিস আমি পাড়াগাঁয়ের ছেলে। পাড়া-গাঁ থেকে সোজা কলকাতায় এসে প্রথমটায় আমার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। নিজে যে গাঁয়ের ছেলে সেটা আমার গা থেকে মুছে ফেলবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলাম। কলকাতার ছেলেদেরও টেক্কা দিয়ে চলবার চেষ্টা করতাম। যে সাবান সাধনা বোস মাখতো সেই সাবান বেশি দাম হলেও কিনে গায়ে মাখতাম। যে-চা বাজারে সব চেয়ে দামী সেই চা-ই খেতাম। তখন ভাবতাম চা খাওয়টা সভ্যতা। ইংরিজী বুঝি আর না বুঝি গ্রেটা গার্বো যে-ছবিতে হিরোইন থাকতো সেই ছবিই টাকা খরচ করে দেখতাম। ভাবতুম ওই সব করলেই লোকে আমাকে কালচার্ড বলবে। তুই সবই তো জানিস। ও-সব কাল্‌চার যে কতো ঠুন্‌কো তা তখন আমি বুঝতুমই না।

একবার পুরী গিয়েছিলাম। রেলের চাকরি তো তাই কোথাও বেড়াতে যেতে আমার ট্রেন-ভাড়া লাগতো না।

সেখানে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে নতুন আলাপ হলো।

তিনি কথায়-কথায় আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনার বাড়ি কোথায় ?

আমি বললাম—কলকাতায়—

ভদ্রলোক তবু জিজ্ঞেস করলেন—বাসা নয়, আপনার বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করছি।

আমি মিথ্যে কথা বললাম। আমি পূর্ববঙ্গের রাজশাহীতে জন্মেছি বললে পাছে ভদ্রলোক আমাকে আন্‌কালচার্ড ভাবে তাই বললাম—আমার বাড়ি বা বাসা দুই-ই কলকাতায়। কলকাতাতেই আমার জন্ম।

ভদ্রলোক তবু ছাড়লেন না। জিজ্ঞেস করলেন—কলকাতার কোথায় ?

আমি তো কালিঘাটে ভাড়া বাড়িতে থাকি। কিন্তু তা তো বলতে পারি না। বললে পাছে তিনি আমাকে আনকালচার্ড ভাবেন, তাই স্রেফ মিথ্যের আশ্রয় নিলাম। তখন বালিগঞ্জ নতুন অভিজাত-পাড়ার সৃষ্টি হয়েছে। তাই বললাম—বালিগঞ্জ-এ—

তবুও তিনি ছাড়লেন না। জিজ্ঞেস করলেন—বালিগঞ্জ-এ কোন্ রাস্তায় ?

আমি বানিয়ে বানিয়ে বললাম—ফার্ন প্লেস্—

মানুষ কত নির্বোধ আর মূর্খ হলে এই ধরনের কথা বলে তা আজ বুঝতে পারি। কিন্তু তখন সে-জ্ঞান আমার ছিল না। মানুষের বাড়ির ঠিকানা, মানুষের জন্ম-স্থান, মানুষের সাজ-পোষাক, এসব দিয়ে যে মানুষের বিচার হয় না, এ কথা বুঝতুম না বা বুঝতে চাইতুমও না।

তারপর ক্রিকেট খেলা দেখা ! সেটাও তো একটা 'কাল্‌চারে'র পর্যায়ে পড়ে আজকাল।

মনে আছে একবার শীতকালে ক্রিকেট খেলার মরশুম শুরু হলো কলকাতায়।

সেই মরশুমের তিনমাস আগে থেকে পাঁচটা গরমের স্যুট তৈরি করিয়ে নিলাম।

বসন্ত জিজ্ঞেস করলে - পাঁচটা স্যুট একসঙ্গে করলি কেন ?

আমি বললাম—পাঁচ দিন ধরে খেলা হবে, তাই পাঁচ দিনে পাঁচটা নতুন স্যুট পরে যাবো—

বসন্ত জিজ্ঞেস করলে—একটা স্যুট পাঁচ দিন পরলে ক্ষতিটা কী হতো ?

আমি বললাম—রোজ একটা স্যুট পরলে যে আশেপাশের লোক গরীব ভাববে আমাকে ! মানুষ যে কতো বোকা, কত আনাড়ি হলে এই কথা ভাবতে পারে, তার নমুনা এই আমিই !

তা এ-ব্যাপারে প্রথম ধাক্কা খেলাম এই আজকের জয়ন্তী মুখার্জীর কাছে।

তুই তো জানিস সে কী এক এক অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল আমাদের সকলকে ওই মেয়েটা। বসন্ত তো আমার সঙ্গে গিয়েছিল ওই জয়ন্তী মুখার্জিকে দেখতে। সে বেঁচে থাকলে বলতে পারতো কী অপমান সে করেছে সেদিন আমাকে—

বলে সুজয় একটু থামলো।

তারপর বললে—কিন্তু এবার সে যে-অপমান আমাকে করলে তার জোড়া নেই—তাহলে ব্যাপারটা গোড়া থেকে শোন্ তুই—

১৯৪৫ সাল পর্যন্ত পৃথিবীটা মোটামুটি একটা ধরা-বাঁধা রাস্তা ধরেই চলছিল। তখনও পৃথিবীর ভিতটা বলতে গেলে মজ্‌বুতই ছিল। ১৮৯৩ সালে চিকাগোর 'কলম্বাস্-হল'-এ ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে বক্তৃতা দিয়ে বিবেকানন্দ সমস্ত আমেরিকাবাসীদের চমকে দিলেন। তার ফলে আমেরিকার কিছু লোক নতুন চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে বাস্তব-জগত থেকে ইণ্ডিয়ার অধ্যাত্মবাদের দিকে আকৃষ্ট হলেন। ভাবলেন এতেই বুঝি মানুষের মুক্তি। সেদিনকার সে-আমেরিকা আজকের আমেরিকা নয়। ১৭৭৫সালে সাম্রাজ্যবাদকে যুদ্ধে হারিয়ে সে-আমেরিকা তখন সবে বৈষয়িক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক সমৃদ্ধির যা-কিছু পঙ্কিলতা সবই সেখানকার সমাজের মানুষের মনে ঢুকে পড়েছে।

ঠিক সেইরকম মানসিক অবস্থায় বিবেকানন্দের বাণী যেন তাদের

ওপর শান্তির প্রলেপের মতো কাজ করলো। তারা বলতে লাগলো —একমাত্র ইণ্ডিয়ার অধ্যাত্মবাদই পশ্চিমের তাপিত পীড়িত মানুষদের মনের শান্তি ফিরিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু তার আগে পৃথিবীতে আরো অনেক দার্শনিক পণ্ডিত এসেছেন। প্লেটো, ম্যাকিয়াভিলি, নীট্‌সে তাঁরা কেউই সমস্ত মানুষকে এমন করে আর শান্তির প্রলেপ দিতে পারেননি। না পেরেছেন সোপেনহাউয়ার, না পেরেছেন হার্বটি স্পেন্‌সার, না পেরেছেন রুশো, না পেরেছেন ক্যাণ্ট্‌, হেগেল বা কার্ল মার্কস্‌।

এই স্বামী বিবেকানন্দই সেখানে যাবার আগে যোগের অপূর্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন।

সেই তারপর থেকেই আস্তে আস্তে ভারতবর্ষের কাছ থেকে পৃথিবীর অভিধানে একটা নতুন শব্দ যুক্ত হলো। সেটা হলো 'যোগ'।

তারপরে এই 'যোগ' শব্দটাই একটা বিরাট লাভজনক ব্যবসাতে পরিণত হলো। এই 'যোগ' বিক্রী করে বড়লোকের দেশের মানুষরা কোটি-কোটি টাকা উপায় করতে লাগলো। ভগবান রজনীশ থেকে আরম্ভ করে স্বামী মুক্তানন্দ, মহেশ যোগীকে কেন্দ্র করে কোটি-কোটি টাকার মুনাফা লুঠতে লাগলো ছুনিয়ার মাফিয়ারা। আর শুধু টাকা নয়, তার সঙ্গে জুটে গেল মেয়ে-মানুষও। সুন্দরী সুন্দরী মেয়েমানুষরাও জুটে গেল এই 'যোগ' ব্যবসাতে। তখন তাদের গাড়ি-বাড়ি সম্পত্তির প্রাচুর্য দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল।

যেমন একদিকে দুঃস্থ বাচ্চা ছেলে-মেয়ে বিদেশে বিক্রি করে অনেকে টাকার পাহাড় জমিয়ে ফেললে, তেমনি তখন 'যোগ' বিক্রি করেও আবার অনেকে কোটি-কোটি ডলারের মালিক হতে লাগলো।

আর পৃথিবীর কর্তারা?

যারা সাধারণ মানুষের প্রতিভূ? যাদের হাতে বন্দুক-রাইফেল-স্টেনগান, উড়ো-জাহাজ আর এ্যাটম্‌-বোমা, তারা? এক-কথায় বলতে গেলে যারা পৃথিবীর সেই কর্ণধার তারা?

তারা তখন নতুন এক পথ ধরলো।

তারা নির্দেশ দিলে যে মানুষকে চিন্তা করবার যেন সময় না দেওয়া হয়। মানুষের চিন্তা করবার অবসর দিলেই তারা আমাদের পেছনে লাগবে। হিটলার বলতেন—ভাববার সময় দিলেই তারা আমার পেছনে লাগবে। ভাববার সময় দিলেই তারা আমাকে উৎখাত করবার জন্যে ষড়যন্ত্র করবে।

আর শুধু হিটলার নয়, পৃথিবীর সব দেশের কর্ণধাররাই চায় যে তাদের প্রজারা যেন কখনও চিন্তা করবার সময় না পায়। তাই তারা মানুষকে নানা-রকম খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চায়। কোনও-কোনও কর্ণধার তাদের দলে টানবার জন্যে উপাধি দেওয়ার রীতির সৃষ্টি করলে। কেউ কেউ দেয় 'নাইট' উপাধি। কেউ-কেউ দেয় 'রায়-বাহাদুর' উপাধি। আবার কেউ কেউ দেয় 'পোয়েট লরিয়েট' উপাধি। এতদিন আমেরিকাতে 'পোয়েট লরিয়েট' উপাধি দেওয়ার রীতি ছিল না। এবার এ-বছর থেকে সেখানে সে-রীতিরও প্রচলন সুরু হলো। আর ইণ্ডিয়ার কথা তো সবাই-ই জানে। এখানে 'সাহিত্য-এ্যাকাডেমী' পুরস্কার, 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রভৃতির সৃষ্টি হলো সেই একই কারণে। আর 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মভূষণ' উপাধিগুলোরও সৃষ্টি হলো সেই একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে।

আর তারপর এলো সিনেমা রেডিও আর টেলিভিশন।

এবার পোয়া বারো। মানুষকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে এর চেয়ে বড় খেলনা এখনও পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। পাঁচদিন ধরে ক্রিকেট খেলা নিয়ে সবাই রাত-দিন মেতে থাকুক টেলিভিশনের সামনে বসে। খেলার হার-জিত্ নিয়ে তারা তর্ক করুক, ঝগড়া করুক। কিন্তু তারা আমাদের যেন না জ্বালায়।

এখন তো তুই দেখছিস ইনডিয়ার অবস্থা। ওদিকে পাঞ্জাব, গোর্খাল্যাণ্ড, মেঘালয়, কাশ্মীর নিয়ে রোজ গাদা-গাদা মানুষ খুন হচ্ছে। সেদিকে তোমরা দেখো না, তা নিয়ে তোমরা ভেবো না। তোমরা রাত-দিন টেলিভিশন আর রেডিওর সামনে বসে ভাবো ক্রিকেট আর ফুটবল খেলায় কে জিতলো আর কে হারলো। ওই নেশায়

তোমরা বুঁদ হয়ে থাকো। আমাদের দিকে তোমরা নজর দিও না, আমাদের শান্তিতে তোমরা ব্যাঘাত ঘটিও না। জিনিস-পত্রের দাম দিন-দিন বাড়ছে বলে তোমরা আমাদের উত্যক্ত কোর না, আমাদের বিরক্ত কোর না, আমাদের বিব্রত কোর না।

ছোটবেলায় ভাই আমিও ওই ভাঁওতাতে ভুলেছিলুম। সে তো সবই তুই জানিস। তাই সিনেমা ক্রিকেট ফুটবল নিয়ে মেতে থাকতুম সারাদিন। মনে করতুম ওই সব নিয়ে মেতে থাকলেই আমার ইজ্জৎ বাড়বে!

কিন্তু আমার সেই ভুল প্রথম ভাঙলো সেই জয়ন্তী। সেই জয়ন্তী মুখার্জি। যার সঙ্গে আমার বিয়ে প্রায় পাকা হয়েই গিয়েছিল। পাকা দেখাটা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল।

আর দ্বিতীয় বার ভুল ভাঙলো যখন আমার মেয়ে জন্মালো। তখন মাথায় এই ভাবনা হলো যে এ-মেয়েকে, আমি কী করে পার করবো।

সে-সব দিনের কথা আমার এখনও মনে আছে যখন ইন্দু প্রায়ই আমার কাছে এসে কাঁদতো। বলতো—আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল বলেই আমাদের বুলাকে এত খারাপ দেখতে হলো, না গো?

আমি মনে মনে সে-সব বিশ্বাস করলেও ইন্দুর সামনে তা স্বীকার করতাম না। বরং উল্টোটাই বলতাম। বলতাম—না না, তা কেন ভাবছো? অনেক সুন্দরী মায়েরও তো কুৎসিৎ মেয়ে হতে দেখেছি। ভগবান আমাদের যা দিয়েছেন তাই নিয়েই খুশী থাকা উচিত।

তারপর শেষ ধাক্কা খেলাম এবার নাগপুরের 'মা আনন্দ ভারতী'র কাছ থেকে। আমার জীবনে এতদিন পর্যন্ত এমন ধাক্কা আগে আর কখনও খাইনি।

তবে শেষটা শোন্! শেষটা শুনলেই তুই সব বুঝতে পারবি।

সুজয় থামলো এবার।

জিজ্ঞেস করলাম—কে 'মা-আনন্দ-ভারতী' ?

সুজয় বললে—ওই নাগপুরের 'যোগ-বিবেক-ভারতী' যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনিই—যেখানে আমার মেয়ে পড়তো, যার পড়া খাওয়া আর থাকার খরচ বাবদ মাসে মাসে আমাকে তিনশো টাকা দিতে হতো।

আর মিস্টার যশোবন্ত ভার্গবের কথাও আগে বলেছি। ওমপ্রকাশ খান্নাজীর জমি-জমা সম্পর্কে মিস্টার ভার্গবের পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়া উপলক্ষ্যে তাকে গ্রেফ্‌তার করার কথাও বলেছি। সেই মামলার জাজমেণ্ট্‌ দেবার দিন আমিও সেদিন নাগপুরের কোর্টে হাজির হয়েছিলাম। অত বড় পোস্টের একজন আই-এ-এস অফিসারকে এ্যারেস্ট্‌ করেছি, এর জন্যে মনে মনে একটু গর্বও ছিল বৈ-কি।

সঙ্গে আমার আর্দালী চরিত্র-মণ্ডলকেও নিয়ে এসেছিলাম। যখন বিশেষ কোনও কাজে কোথাও আমাকে যেতে হতো তো তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম।

কোর্টের ভেতরে সেদিন অনেক ভিড়। মিস্টার ভার্গবকে ধরার পর খবরের কাগজেও খবরটা বেশ ঘটা করে ছাপাও হয়েছিল। সেই খবরটা জানাজানি হবার পর সারা শহরটাতেই হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। আর তার ফলেই অত ভিড় হয়েছিল কোর্টের ভেতরে।

আমার কাছে সুধাকর থারেও বসে ছিল। ওই কেসটা ধরার পর 'ইনফরমার' হিসেবে তাকেও তার পারিশ্রমিক বাবদ শ'দুয়েক টাকা পাইয়ে দিয়েছিলাম। তাকে কথা দিয়েছিলাম যে ভবিষ্যতে তাকে একটা চাকরিও পাইয়ে দেব।

তাই সে অধীর আগ্রহে ম্যাজিস্ট্রেটের রায় শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

আর একটু দূরে খান্নাজীও বসে ছিলেন অন্য আরো অনেকের সঙ্গে। তাঁরও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের ওপর।

যথা সময়ে ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটায় ম্যাজিস্ট্রেট

এজলাসে এসে হাজির হলেন।

আমরা সবাই কান পেতে রইলাম।

ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর রায় পড়তে লাগলেন।

মিনিটের পর মিনিট চলে যাচ্ছে আর আমরা সবাই বসে বসে শুনছি। মিস্টার যশোবন্ত ভার্গবও শুনছেন সেই রায়। মাঝে মাঝে আমি তাঁর দিকে চেয়ে দেখছিলাম। তাঁর যেন কোনও বিকারই নেই। তিনি যেন নিরুত্তাপ, নিরুদ্বিগ্ন। নির্বিকার। এমন ভাব যেন অন্য কোনও লোকের বিচার শুনতে কোর্টে বেড়াতে এসেছেন। তিনি যেন এ-মামলায় সংশ্লিষ্ট নন্।

মোট পঞ্চাশ পৃষ্ঠার লিখিত রায়।

পড়া শেষ হলে তখন সমস্ত কোর্টঘর স্তব্ধ। সবাই যেন হতাশ। সবাই একটা উত্তেজনা নিয়ে এসেছিল, কিন্তু আসামীকে সন্দেহের অবকাশে মুক্তির রায় দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর বক্তব্য শেষ করে এজলাস ছেড়ে চলে গেলেন।

আমি কী করবো বুঝতে পারছিলাম না। আমি এত ভেবে এত আট-ঘাঁট-বেঁধে এত সযত্নে মিস্টার ভার্গবকে এ্যারেস্ট করেছিলাম যে তাঁর মুক্তি পাওয়ার কোনও যুক্তিই ছিল না।

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

সুধাকর খারেও উঠে দাঁড়ালো। আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে —এটা কী হলো দাদা?

আমি এ-প্রশ্নের কী জবাব দেব?

ওমপ্রকাশ খান্নাজী আমার সঙ্গে দেখা না করেই কখন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন তা টের পাইনি।

সুধাকর খারের সঙ্গে আর কথা বলতে ভালো লাগছিল না।

তাকে বললাম—তুমি এখন যাও, আমার আর কথা বলতে ভালো লাগছে না এখন—

আমার আরদালি চরিত্র মণ্ডলকে ট্যাক্সি ডাকতে বলাতে সে একটা ট্যাক্সি আনলো। আমি তাইতে উঠে আমার হোটেলের ঘরে চলে

এলাম।

তখন আমার কিছুই ভালো লাগছিল না। ভাবছিলাম—এ কী হলো? কোথায় আমার কী ভুলটা হলো যে আমার পাকা ঘুঁটিটা এমন করে কেঁচে গেল?

চরিত্র মণ্ডল এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলে—খাবার দিতে বলবো বাবু?

বললাম—না, এখন আমার ক্ষিধে নেই, পরে—

চরিত্র মণ্ডল চলে গেল। আমি বিছানার ওপর শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম করতে করতে কখন তন্দ্রা এসেছিল টের পাইনি। শুধু শারীরিক ক্লান্তিই নয়, তার চেয়ে বেশি ছিল মানসিক ক্লান্তি। মানসিক ক্লান্তিই শারীরিক ক্লান্তির চেয়ে বেশি ক্ষতিকর। কেবল ভাবতে লাগলাম—এ কী হলো? এ-রকম কেন হলো আমার?

তখনও জানি না যে আরো কত বড়ো আঘাত আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

ঘরের বাইরের দিকে একটা ব্যাল্‌কনি ছিল। সেই ব্যাল্‌কনিতে একটা চেয়ার নিয়ে গিয়ে তার ওপরে বসে সমস্ত শহরটার দিকে নজর দিয়ে দেখতে লাগলাম। বিরাট শহর, তার কোঠরে কোঠরে আলো জ্বলছে। বোঝা গেল শহর তখনও জেগে আছে। সবাই তখন আনন্দ উৎসবে মত্ত। নিশ্চয়ই তখন টেলিভিশনে ফুটবল কিম্বা ক্রিকেট খেলার চলন্ত ছবি দেখতে কিংবা নাটক দেখতে ব্যস্ত।

হঠাৎ আমার নজরে পড়লো নিচের হোটেলের সদর দরজার সামনে একটা বিরাট বিলিতি গাড়ি যেন এসে থামলো। থামতেই ড্রাইভারটা নিজের সীট্ ছেড়ে বাইরে এসে পেছনের সীটের দরজা খুলে দিয়ে সসম্ভ্রমে একটু দাঁড়ালো।

আর ভেতর থেকে আগাগোড়া গেরুয়া পরা একজন মহিলা গাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে হোটেলের ভেতরে ঢুকে পড়লো।

ছুনিয়ার কতো রকমের জীবই আছে, কতো তাদের রকম-ফের কতো তাদের বৈচিত্র্য! ও-সব ধাপ্পা দেখে আর ভোলার বয়েস চলে

গেছে।

কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি যে আমার জন্যে তখনও কতো বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে।

খানিক পরেই আমার আরদালি চরিত্র মণ্ডল এসে খবর দিলে আমার সঙ্গে কে একজন দেখা করতে এসেছে।

জিজ্ঞেস করলাম—কে, কে দেখা করতে চায়?

চরিত্র মণ্ডল বললে—'মা আনন্দ ভারতী'—

আমি অবাক। কিন্তু তারপরে ভাবলাম—আমার মেয়ে ওঁর 'যোগ বিবেক ভারতী'তে পড়ে, সেই জন্যে হয়তো এখানে আমার আসার খবর পেয়ে দেখা করতে এসেছেন—

বললাম—ডাক্—

আমি ঘরের ভেতরে গিয়ে একটা সোফার ওপর বসলাম।

দেখলাম সেই গেরুয়া রং-এর শাড়ি পরা ঘোমটা দেওয়া মহিলাটি আমার ঘরে ঢুকলেন।

আমি তাঁকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করে বসতে বললাম।

কিন্তু তিনি বসলেন না। বললেন—আমি বসবো না। আমার অনেক কাজ আছে এখন। আমি শুধু দু'একটা কথা বলতে এসেছি আপনাকে। কথা ক'টা বলেই আমি চলে যাবো—

আমি বললাম—আমি বসে থাকবো আর আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন, এটা কি ভালো দেখাবে—

মহিলাটি বললেন—ভালো না দেখালেও আমি বসবো না এখন, আমার বসার সময় নেই এখন।

সুতরাং আমিও দাঁড়িয়ে উঠলাম।

মহিলাটি বললেন—আমার পরিচয় আপনার আরদালি নিশ্চয় আপনাকে দিয়েছে—এখানে সবাই আমাকে 'মা আনন্দ ভারতী' বলেই জানে। এখানে 'যোগ বিবেক ভারতী' বলে যে প্রতিষ্ঠানটা আছে, ওটা আমিই চালাই—

বললাম—হ্যাঁ, আমার মেয়ে 'মিথিলা' ওখানকার একজন ছাত্রী।

আমার স্ত্রী তাকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে আপনাদের 'যোগ বিবেক ভারতী'তে—

মহিলাটি বললেন—ঠিক সে-প্রসঙ্গ বলতে আমি আপনার কাছে আসিনি। আমি এসেছি অন্য কথা বলতে—

—কী কথা?

মহিলাটি বললেন—আমি বলতে এসেছি এখানকার কোর্টে আজকে মিস্টার যশোবন্ত ভার্গবের যে-কেসের জাজমেণ্টটা দেওয়া হলো, সেই ব্যাপারে—

আমি তাঁর কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না।

বললাম—মিস্টার যশোবন্ত ভার্গবের মামলার জাজমেণ্টের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?

মহিলাটি বললেন—সম্পর্ক আছে বলেই তো বলছি, নইলে আমি আপনার কাছে আসতুম না—

আমি তবু কিছু বুঝলাম না, তাই চুপ করে রইলাম।

মহিলাটি বললেন—আপনি তো অনেক চেষ্টা করেছিলেন মিস্টার ভার্গবকে শাস্তি দিতে। আপনি তো চেয়েছিলেন যে মিস্টার ভার্গবের কনভিকশন হোক—

বললাম—তা তো চেয়েছিলাম—

মহিলাটি বললেন—তা কি পারলেন? তাঁকে তো ম্যাজিস্ট্রেট ছেড়েই দিলেন।

আমি আর তাঁর কথার কী জবাব দেব!

মহিলাটি বললেন—কেন ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে ছেড়ে দিলেন তা কি জানেন আপনি?

বললাম—ছাড়লেন 'বেনিফিট্ অব্ ডাউট'-এর ভিত্তিতে—

মহিলাটি বললেন—না, তা নয়, ছাড়লেন এই জন্যে যে আজকের ম্যাজিস্ট্রেটও মোটা ঘুষ খেয়েছেন!

—সে কী?

—হ্যাঁ, আর সে-ঘুষ দিয়েছি আমি!

অবাক হয়ে রইলাম। আমার মুখ দিয়ে শুধু বেরোল—আপনি? আপনি ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘুষ দিয়েছেন? বলছেন কী আপনি?

মহিলাটি বললেন—হ্যাঁ, আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে এক লাখ টাকা ঘুষ দিয়েছি।

—এক লাখ টাকা? মিস্টার ভার্গবের জন্যে আপনি অত টাকা ঘুষ দিতে গেলেন কেন? আপনার কী স্বার্থ?

মহিলাটি বললেন—তিনি আমার স্বামী!!!

আমার মাথার ওপর বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হলেও আমি বোধকরি অতো অবাক হতাম না।

বললাম—মিস্টার ভার্গব আপনার হাজব্যাণ্ড? সত্যি বলছেন?

—হ্যাঁ।

বললাম—কিন্তু আপনাকে তো সবাই 'মা-আনন্দ-ভারতী' বলেই জানে। সবাই আপনাকে সন্ন্যাসিনী বলেই জানে।

মহিলাটি বললেন—সেটা তো আমার বাইরের পরিচয়। মানুষের বাইরের পরিচয়টাই কি সব?

এর জবাবে আমি কী বলবো?

মহিলাটি বললেন—যা'হোক, অতো কথা আমি খুলে বলতে চাই না আপনাকে। আপনি আমার কেউ না, সুতরাং এর বেশি আপনাকে আমি বলতে চাইও না। শুধু এইটুকুই বলে যাই যে যতোই চেষ্টা করুন আপনি আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবেন না—

এবার আমার মুখে কথা ফুটলো। বললাম – আমি আপনার ক্ষতি করতে চাইবোই বা কেন? আমার চাকরিই তো ঘুষখোর ধরা, সেই জন্যেই আমি মিস্টার ভার্গবকে ধরেছিলুম। আপনাকে তো আমি চিনিই না—

মহিলাটি বাধা দিয়ে বললেন—না, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। আপনি আমাকে চেনেন—

—আমি আপনাকে চিনি? এ কী বলছেন আপনি? আমি তো জীবনে কখনও আপনাকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। আর শুধু

আপনাকেই নয়, কোনও আশ্রম বা কোনও সেবা প্রতিষ্ঠানের সাধু-সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গেও আমার কখনও জানা-শোনা হয়েছে বলে আমি মনে করতে পারছি না—

মহিলাটি বললেন—কোনও মানুষ জন্মেই তো আর সাধু-সন্ন্যাসী হয় না। নানা ঘটনাচক্রে পড়ে বড় হয়ে তবেই সে ওই সব হয়।

বললাম—আপনি একদিকে বলছেন যে আপনি মিস্টার ভার্গবের স্ত্রী। আবার সঙ্গে সঙ্গে গেরুয়া-রং-এর শাড়ি পরেছেন। এ দুটোর মধ্যে আমি কোনও সামঞ্জস্য করতে পারছি না—

মহিলাটি বললেন—আগে যা ছিল তা ছিল, কিন্তু এখন দিনকাল বদলে গেছে। আগে সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে টাকা-কড়ির কোনও সম্পর্ক থাকতো না, কিন্তু এখন তো তা নয়। এখন সাধু-সন্ন্যাসীদেরও ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্ট থাকে, তারাও অনেক কোম্পানীর শেয়ার কেনাবেচা করে। তফাৎ শুধু এই যে তাদের কোনও ইনকাম-ট্যাক্স দিতে হয় না—। এ-সব কথা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে!

স্বীকার করতেই হলো যে আমি ও-ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ।

মহিলাটি বললেন—আপনি না জানেন তো আমার কাছে তা জেনে নিন। সে-কালের সব কিছু জিনিসের মূল্যায়ন বদলে গেল, আর সাধু-সন্ন্যাসীদের বেলাতেই ডেফিনিশন শুধু বদলাবে না, তা কি হতে পারে?

—কিন্তু গেরুয়া ধুতি-শাড়ি তো ত্যাগেরই প্রতীক!

মহিলাটি বললেন—কে বললে? এই ভুল ধারণা নিয়ে আপনি পুলিশের চাকরি করছেন? লাল-সবুজ-নীল যেমন রং গেরুয়াও তো তেমনি একটা রং। এর সঙ্গে ত্যাগের কোনও সম্পর্ক নেই—

আমি বললাম—কিন্তু তা হলে গেরুয়া রং-এর কাপড় পরা লোক দেখলে হিন্দুরা কেন তার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করে?

মহিলাটি বললেন—ওটাই ওদের ভাঁওতা!

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তা হলে 'যোগ-বিবেক-ভারতী' নাম

দিয়ে যে প্রতিষ্ঠানটা আপনি খুলেছেন, সেটাও কি ভাঁওতা ?

মহিলাটি জোরের সঙ্গে বললেন—নিশ্চয়ই।

—তার মানে ?

মহিলাটি বললেন—ওই নামের জায়গায় যদি 'দি মডেল গার্লস্ স্কুল' নাম দিতুম তাহলে আমাদের স্কুলে মেয়েদের ভর্তি করবার জন্যে গার্জেনদের কি এত হুড়োহুড়ি পড়তো ? আমি জানতুম যে ওই 'যোগ' শব্দটার ওপর আজকাল পৃথিবীর সমস্ত মানুষের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। সেই জন্যেই ওই 'যোগ' শব্দটা আমি ব্যবহার করেছি। তাতে সাধারণ মানুষ যেমন ভুলেছে, আমাদের দেশের গভর্নমেণ্টও তেমনি ভুলেছে। তাই তো গভর্নমেন্টের অন্য স্কুলের চেয়ে আমাদের 'যোগ-বিবেক-ভারতী'কে বেশি গ্র্যাণ্ট দেয়। আমরা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে বছরে লক্ষ-লক্ষ টাকার গ্র্যাণ্ট পাই ওই 'যোগ' শব্দটা থাকার জন্যে।

আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম—তা মিস্টার ভার্গব যে আপনার স্বামী তা কেউ জানে ?

মহিলাটি বললেন—তা কেন জানবে ? তা জানলে তো আমার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। কেউ আর আমার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায়ও ঠেকাবে না।

বললাম—আর আপনার স্কুলে যারা টিচার, তারা ? 'মা বিদ্যা ভারতী,' 'মা শক্তি ভারতী,' 'মা প্রজ্ঞা ভারতী,' তাদেরও কি সব স্বামী আছে ?

মহিলাটি বললেন—আছে, কিন্তু বাইরের কেউ তা জানে না। জানানো নিয়মই নেই। জানতে পারলে তাদের আর চাকরি থাকবে না। সেই জন্যে তাদের সন্তান হওয়াও নিয়ম-বিরুদ্ধ !

তারপরে একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—যাক গে এ-সব কথা, আরো একটা কাজের কথা আপনাকে বলে যাই—

বলে তিনি তাঁর কাঁধে ঝোলানো গেরুয়া-রং-এর ঝুলি থেকে একটা ছোট ব্যাগ বার করলেন। সেই ব্যাগ থেকে কী যেন একটা জিনিস

বার করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—এ দুটো জিনিস কি আপনি চিনতে পারছেন ?

আমি লক্ষ্য করে দেখলাম সে দু'টো মেয়েদের সোনার কানের দুল।

মহিলাটি আবার জিজ্ঞেস করলেন—পারছেন চিনতে ?

আমি তবু চিনতে পারলাম না।

বললাম—না তো, আমি চিনতে পারছি না তো ঠিক।

মহিলাটি এবার বললেন—আপনার বাবা আমার বিয়ের আগে পাকা-দেখার সময় এই সোনার দুল দু'টো দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। সে-বিয়ে অবশ্য শেষ মুহূর্তে আমিই ভেঙে দিয়েছিলুম, কিন্তু এই দুল দু'টো আর ফেরৎ দেওয়া হয়নি, আমাদের কাছেই রয়ে গিয়েছিল, আপনারাও আর তা ফেরৎ চাননি।

আমি তাঁর কথা শুনে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি—

জিজ্ঞেস করলাম তাহলে আপনার নাম কি....

মহিলাটি বললেন—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন।

বললাম—আপনিই সেই জয়ন্তী মুখার্জি ?

জয়ন্তী মুখার্জি বললে—হ্যাঁ—

তারপর একটু থেমে বললে—যখন শুনলাম যে আপনিই মিস্টার ভার্গবকে ট্র্যাপ্ করেছেন, তখন আর থাকতে পারলাম না। ম্যাজিস্ট্রেটকে এক লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে তাঁকে ইনফ্লুয়েন্স করলাম। তার ফল তো আপনি নিজেই আজ দেখতে পেলেন। মিস্টার ভার্গবকে সব চার্জ থেকে রিলিজ করে দিলেন তিনি। আর যখন খবর পেলাম যে আপনি এখানকার এই হোটেলে এসে উঠেছেন, তখন ওই সোনার দুল জোড়াও আপনাকে দিয়ে গেলাম। ওটা আপনাদেরই দেওয়া, আমার কোনও অধিকার নেই ওটার ওপর। আমি চলি এবার—

বলে সেই জয়ন্তী মুখার্জি ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেল—

সুজয় বললে—তাই বলছিলাম ভাই, শেষ পর্যন্ত, সে এলো। অথচ একদিন আমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সবাই-ই আশা করেছিল সে আসবে। সে এসে আমাদের সংসার আলো করে দেবে।

কিন্তু মনে হলো সেদিন সে না এসে বোধহয় ভালোই করেছে। সেদিন সে এলে তো আর বুঝতেই পারতুম না যে কতো পাপ, কত অন্যায়, কত অনাচার, কত অত্যাচার, কত অবিশ্বাস, কত কালো টাকা, কতো ঘুষ, আমাদের দেশে চলতে আরম্ভ করেছে। বুঝতেই পারতুম না আমাদের দেশ কত নিচুতে নেমে গেছে, বুঝতেই পারতুম না আমরা নিজেরাও কত অন্ধকার নরকে নেমে গিয়েছি। বুঝতেই পারতুম না যে আমাদের ধর্ম, আমাদের বিবেক, আমাদের জীবন, আমাদের কালচার, সব কিছুকেই আজ গ্রাস করেছে টাকা। এখন টাকাই আমাদের কাছে ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম হয়ে উঠেছে। এখন পয়সাই আমাদের কাছে হয়ে উঠেছে পরমেশ্বর।

—তারপর ?

সুজয় বললে—তারপর আর কী। তারপর আমার ওই ডেপুটেশনের চাকরিটাও চলে গেল। আর আমিও আমার রেলের চাকরিতে আবার ফিরে এলাম। আর আমার মেয়েকেও সেই স্কুল থেকে ওরা ছাড়িয়ে দিল। আমি অনেক আশা নিয়ে ওই চাকরিতে গিয়েছিলাম ভাই। কিন্তু আমি কিছুই করতে পারলাম না। আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম দেশ থেকে কালো টাকা দূর করতে। কিন্তু ভাই আমি স্বীকার করছি আমি তা পারলাম না। শেষ পর্যন্ত আমি হেরে গেলাম। সরকারী অফিসাররাও ঘুষ নেবেন, আবার গেরুয়া পরা সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরাও ঘুষ নেবেন, তাহলে আমরা কার কাছে যাবে ? কার কাছে গিয়ে আমরা আশ্রয় চাইবো ?

সমাপ্ত